বিচার

এক্, দো, তিন্ ! ! !

কয়লা-খাদের মুখে 'ঘণ্টাওয়ালা' ঘণ্টা বাজাইল—এক্ দো, তিন্ !

নীচে হইতে গম্ গম্ করিয়া চানকের* গহ্বরের স্তরে স্তরে প্রতি-ধ্বনিত হইয়া উত্তর আসিল,—ঠং, ঠং, ঠং ! ! !

তিন-ঘণ্টা—মানুষ নামিবার সঙ্কেত।···খাদের নীচে খুন হইয়াছে। সর্দ্দারের কাছে খবর পাইয়া খাদের 'রেজিং বাবু'—চঞ্চলকুমার, ডাক্তার-বাবু ও ম্যানেজার-সাহেব লাশ দেখতে চলিলেন।

পৌষের সন্ধ্যা। দূরে একটা বিস্তীর্ণ প্রান্তরের ওপারে শালবনের মাথার উপর চাঁদ উঠিয়াছিল, কিন্তু বড় বড় পত্রহীন দু'একটা গাছের শীর্ণ ডালপালার মধ্যে অর্দ্ধেকের বেশী দেখা যায় না; তথাপি কাটা ধানের মাঠগুলার উপর কুয়াশার মত ধূমে আচ্ছন্ন আধ-ফুটন্ত জ্যোৎস্নার হিল্লোল বেশ একটা স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছিল।

---

* 'চানক'—(এতদ্দেশে প্রচলিত বাঙলা কথা) কূপের মত খনির মুখগহ্বর।

উপরে যখন এই আনন্দ-সুন্দরের খেলা, খাদের নীচে তখন কোন্ এক নিবিড় আঁধার-ঘন গুহায় নরঘাতন্ নিষ্ঠুরতার নগ্ন বীভৎসতা!

তিনজন সর্দ্দার আর একজন ঘণ্টাওয়ালা ছাড়া খাদের সমস্ত কুলি তখন উপরে উঠিয়া আসিয়াছে।

তিনটা গ্যাস্-ল্যাম্প্ লইয়া সর্দ্দার তিনজন পথ দেখাইয়া সকলকে সেই অন্ধকার পাতালপুরীর সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া লইয়া চলিল। সম্মুখে একটুখানি স্থান ছাড়া, পশ্চাতে এবং দুই পার্শ্বে বিরাট্ অন্ধকার যেন মূর্চ্ছাহত হইয়া পড়িয়া আছে। কতকগুলা পায়ের শব্দ এবং মাঝে মাঝে দু'-একটা কথা! তা ছাড়া কোথাও এতটুকু সাড়া-শব্দ নাই।

—এইটা সাতে যাবার মেন্-গ্যালারী।

—চালটা এখানে একটু খারাপ আছে।

—হ্যাঁ, একটু সাবধানে আস্বেন।

—ইস! পাশের গোফ্টার কি ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়েছে দেখুন।

মাঝে-মাঝে এম্নি দু-একটা কথা, আবার সব চুপ্।

একসঙ্গে কতকগুলা পায়ের জুতার শব্দ!

অগ্রগামী সর্দ্দার হঠাৎ একটা সুড়ঙ্গের মুখে গিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

—হ্যাঁ, এহি তেরা নম্বর কাঁথি।

গ্যাসের আলোটা তুলিয়া ধরিয়া আর-একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকিয়া বলিল, আইয়ে বাবুজি।

বৃদ্ধ ম্যানেজার—মিষ্টার জেম্স, কয়লাকুঠিতে কাজ করিয়া চুল পাকাইল; বাঙলা ভাষায় কথাবার্ত্তা বেশ ভালই বলিতে শিখিয়াছে।

জল-শপ শপে পথের মধ্যে চলিতে চলিতে সাহেব সতর্ক করিয়া দিল,—একটু সাবধানে, চালের পাথরটা এখানে বড্ডো নরম।

পাশে একটা পিলারের পাশে ছাদ হইতে প্রকাণ্ড একটা পাথরের চাংড়া সশব্দে ঝড়াং করিয়া ছাড়িয়া পড়িল।

'ওরে বাপ্‌রে' বলিয়া দৌড়িয়া গিয়া সকলে ম্যানেজার-সাহেবকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল,—তিনিই এখানে একমাত্র ভরসা-স্থল।

আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া সকলেরই বুকগুলা তখন ধাঁই-ধাঁই করিতেছিল।

—ওটা মাথায় পড়্‌লেই গিয়েছিলুম আর-কি!

—এদিকে সরে' আসুন, আর ভয় নেই, এটা খুব 'সেফ্‌'।

......মিষ্টার জেমস্‌ হাতের বাতিটা তুলিয়া ধরিতেই সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, এক সাঁওতাল যুবক হুমড়ি খাইয়া কয়লাস্তূপে মুখ গুঁজিয়া সেই-খানে পড়িয়া আছে। একটা কয়লার প্রকাণ্ড চাংড়া তাহার মাথার উপর পড়িয়া মুখের খানিকটা অংশ উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। কানের ভিতর দিয়া এক ঝলক্‌ রক্ত বাহির হইয়া আসিয়া কালো কয়লার উপর জমাট বাঁধিয়াছে। লোহার গাঁইতিখানা হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে।

ডাক্তারবাবু তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া তাহাকে বেশ করিয়া পরীক্ষা করিলেন।

কি দেখ্‌ব আর—বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডাক্তারবাবু সরিয়া দাঁড়াইলেন।

চঞ্চলকুমার মুখে কিছুই বলিল না। সেও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া

চুপ করিয়া রহিল। সাহেবের মুখের পানে একবার তাকাইতেই সাহেব চোখ টিপিয়া কহিল, Come along ! চলে' আসুন।

অন্য পথ দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া অতি সাবধানে পথ দেখাইতে দেখাইতে সাহেব সকলকে লইয়া চানকের মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনজন সর্দ্দার মৃতদেহটা একটু সরাইয়া রাখিয়া কাঁথির মুখে কাঁটাতারের বেড়া দিয়া তাহাদের কাছে ফিরিয়া আসিল।

অন্-সেটার * পুনরায় ঘণ্টা মারিয়া তাহাদের উপরে তুলিয়া দিল। তখন রাত্রি হইয়াছে। খাদের নীচে যেমন অন্ধকারের অন্ত নাই, উপরে তেমনি জ্যোৎস্নার ছড়াছড়ি!

এক যুবতী সাঁওতালের মেয়ে ট্রাম-লাইনের ধারে তাহাদেরই অপেক্ষা করিতেছিল। সজল চোখে তাহাদের মুখের পানে একবার তাকাইয়া সে সকরুণ ভাবে কহিয়া উঠিল,—টুইলাকে একলাটি ফেলে রেখে এলি বাবু?

কাছেই কয়েকজন সাঁওতাল দাঁড়াইয়া ছিল; একজন বুঝাইয়া দিল, এ মৃত টুইলার স্ত্রী সোহাগী। এ ছাড়া তাহার নিজের বলিতে আর কেহই নাই।

চঞ্চলকুমার থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িতেই সাহেব ও ডাক্তারবাবু

---

* 'অন্-সেটার'—খাদের-নীচে যে ব্যক্তি ঘণ্টা বাজাইয়া উপরের [illegible]ওয়ালাকে ইঞ্জিন্ চালাইবার সঙ্কেত জানায়। এক ঘণ্টা—খালি টব-গাড়ী, দু ঘণ্টা—কয়লা-বোঝাই টব-গাড়ী, এবং তিন ঘণ্টা—মানুষ উঠিবার সঙ্কেত। উপরে আর-একজন ঘণ্টাওয়ালা থাকে, তাহারও ঐ একই কাজ। 'অন্-সেটারের' অর্থ এক-কথায় বলা চলে—'খাদের নীচের ঘণ্টা-ওয়ালা'।

দাঁড়াইলেন। সোহাগী আবার বলিল—একা সে রইতে লারবেক্ বাবু। আমাকে যেতে দে,—আমি যাই।

চঞ্চলকুমারের চোখ দুইটা ছল্‌ছল্ করিতেছিল, বলিল,—কি করবি সোহাগী, সে তো মরেই গেছে। পুলিশ এলেই তুলে দেব।......আয়, তুই আমাদের সঙ্গে আয়!

সোহাগী ভাবিল, ম্যানেজার-সাহেব একবার হুকুম করিলেই তাকে নীচে নামিতে দিবে, তাই সে উন্মাদিনীর মত সাহেবের পা দুইখানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—তুই একবার বল্ সাহেব, আমি সারারাত টুইলাকে আগুলে থাক্‌ব। একলাটি তাকে রইতে দিতে লারব যে আমি!

সোহাগী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সাহেব সজোরে বুটের এক ধাক্কা দিয়া সোহাগীর হাত হইতে পা ছাড়াইয়া লইয়া বলিল,—নেই, হাম কিসিকো নেই যানে দেগা। ছোড়ী পাগ্‌লী হো গিয়া,—যাও!

কয়েকজন সাঁওতাল কুলি দূরে দাঁড়াইয়া ছিল; সাহেব তাহাদের কাছে ডাকিয়া সাবধান করিয়া দিল।—মৎ যানে দেও উস্‌কো। পুলিস্ আনেসে হাম্ লাশ উপরমে লে আয়েগা। যাও, হাত পাকড়্‌কে ইস্‌কো ধাওড়ামে লে চলো।...Come along, Babus, come along! I can't allow her to come down the pit. She may do anything, kill herself even!......

চঞ্চলকুমার ভাবিতেছিল এই শোকাতুরা রমণীকে খাদের নীচে তাহার মৃত স্বামীর নিকট একটিবার লইয়া গেলে যদি তাহার শোকের মাত্রা কম

চুপ করিয়া রহিল। সাহেবের মুখের পানে একবার তাকাইতেই সাহেব চোখ টিপিয়া কহিল, Come along! চলে' আসুন।

অন্য পথ দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া অতি সাবধানে পথ দেখাইতে দেখাইতে সাহেব সকলকে লইয়া চানকের মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনজন সর্দ্দার মৃতদেহটা একটু সরাইয়া রাখিয়া কাঁথির মুখে কাঁটাতারের বেড়া দিয়া তাহাদের কাছে ফিরিয়া আসিল।

অন্-সেটার * পুনরায় ঘণ্টা মারিয়া তাহাদের উপরে তুলিয়া দিল। তখন রাত্রি হইয়াছে। খাদের নীচে যেমন অন্ধকারের অন্ত নাই, উপরে তেমনি জ্যোৎস্নার ছড়াছড়ি!

এক যুবতী সাঁওতালের মেয়ে ট্রাম-লাইনের ধারে তাহাদেরই অপেক্ষা করিতেছিল। সজল চোখে তাহাদের মুখের পানে একবার তাকাইয়া সে সকরুণ ভাবে কহিয়া উঠিল,—টুইলাকে একলাটি ফেলে রেখে এলি বাবু?

কাছেই কয়েকজন সাঁওতাল দাঁড়াইয়া ছিল; একজন বুঝাইয়া দিল, এ মৃত টুইলার স্ত্রী সোহাগী। এ ছাড়া তাহার নিজের বলিতে আর কেহই নাই।

চঞ্চলকুমার থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িতেই সাহেব ও ডাক্তারবাবু

---

* 'অন্-সেটার'—খাদের-নীচে যে ব্যক্তি ঘণ্টা বাজাইয়া উপরের [illegible]ওয়ালাকে ইঞ্জিন্ চালাইবার সঙ্কেত জানায়। এক ঘণ্টা—খালি টব-গাড়ী, দু ঘণ্টা—কয়লা-বোঝাই টব-গাড়ী, এবং তিন ঘণ্টা—মানুষ উঠিবার সঙ্কেত। উপরে আর-একজন ঘণ্টাওয়ালা থাকে, তাহারও ঐ একই কাজ। 'অন্-সেটারের' অর্থ এক-কথায় বলা চলে—'খাদের নীচের ঘণ্টা-ওয়ালা'।

দাঁড়াইলেন। সোহাগী আবার বলিল—একা সে রইতে লায়্‌বেক্ বাবু। আমাকে যেতে দে,—আমি যাই।

চঞ্চলকুমারের চোখ দুইটা ছল্‌ছল্ করিতেছিল, বলিল,—কি কর্‌বি সোহাগী, সে তো মরেই গেছে। পুলিশ এলেই তুলে দেব।......আয়, তুই আমাদের সঙ্গে আয়!

সোহাগী ভাবিল, ম্যানেজার-সাহেব একবার হুকুম করিলেই তাকে নীচে নামিতে দিবে, তাই সে উন্মাদিনীর মত সাহেবের পা দুইখানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—তুই একবার বল্ সাহেব, আমি সারারাত টুইলাকে আগুলে থাক্‌ব। একলাটি তাকে রইতে দিতে লায়্‌ব যে আমি!

সোহাগী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সাহেব সজোরে বুটের এক ধাক্কা দিয়া সোহাগীর হাত হইতে পা ছাড়াইয়া লইয়া বলিল,—নেই, হাম কিসিকো নেই যানে দেগা। ছোড়ী পাগলী হো গিয়া,—যাও!

কয়েকজন সাঁওতাল কুলি দূরে দাঁড়াইয়া ছিল; সাহেব তাহাদের কাছে ডাকিয়া সাবধান করিয়া দিল।—মৎ যানে দেও উস্‌কো। পুলিস্ আনেসে হাম্ লাশ উপরমে লে আয়েগা। যাও, হাত পাকড়্‌কে ইস্‌কো ধাওড়ামে লে চলো।...Come along, Babus, come along! I can't allow her to come down the pit. She may do anything, kill herself even!......

চঞ্চলকুমার ভাবিতেছিল এই শোকাতুরা রমণীকে খাদের নীচে তাহার মৃত স্বামীর নিকট একটিবার লইয়া গেলে যদি তাহার শোকের মাত্রা কম

হয় কিছু, তাহা হইলে এমন কি ক্ষতি হইতে পারে! কিন্তু সাহেব যখন অনুমতি দিল না, তখন অগত্যা তাহাকেও চুপ করিয়া থাকিতে হইবে।

সাহেব নিজের আপিসে বসিয়া চঞ্চলকুমারকে ডাকিয়া পাঠাইল। চঞ্চল কাছে যাইতেই দেখিল, সাহেব মুখে একটা তামাকের 'পাইপ' ধরাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছে। চঞ্চলকে পাশের চেয়ারে বসিতে বলিয়া বলিল,—কি করা যায়, চঞ্চলবাবু?

চঞ্চলকুমারের মনটা ব্যথায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, একটু রাগিয়াই উত্তর দিল,—আমাকে কেন পাপের ভাগী করলে সাহেব? আমি আগে থেকেই বলে' এসেছি, খাদে কোথাও এতটুকু আয়তন নেই, বেশী রেজিংএর আশা ছেড়ে দাও। তুমি আমার সে কথা শুনলে না, বল্লে নেহি মাংতা কুছ্—রেজিং চাই—রেজিং!...নাও এবার রেজিং!...ও 'আন্‌সেফ গ্যালারীতে' ও-বেচারাকে কেন পাঠালে সাহেব?

সাহেব ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—তুমি ছেলেমানুষ চঞ্চল, কিছু বুঝতে পার না।...বাঙালীর ওই তো দোষ, একটু কিছু হ'লেই অম্‌নি ভয়েই অস্থির!

চঞ্চলকুমার মুখে কিছু না বলিলেও অন্তর্যামী হয়তো বুঝিলেন, কিসের ভয়ে আজ তাহার মুখে কথা ফুটিতেছে না। পুলিশের পরোয়ানার ভয় সে বড় একটা করে না; কিন্তু সবার উপরে যিনি আছেন, তাঁহার কাছে সে কি জবাবদিহি করিবে? চঞ্চল মনে-মনেই বলিল, নির্দ্দোষ ওই সাঁওতাল কুলিযুবকের প্রাণের দাম, তোমার রেজিংএর দামের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান্‌। নিজের স্বার্থের জন্য নিরীহ বেচারীদের খুন ক'রে সাহসী

হওয়ার চেয়ে বাঙ্গালী যেন তার ভীরুতার কলঙ্ক নিয়েই বেঁচে থাকে চিরকাল,—তাতে আমার কোন ক্ষতি হবে না সাহেব।

চঞ্চলকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া, সাহেব বলিল,—কুছ্ পরোয়া নেই। এমন কত খুন হয়ে গেছে আমার হাতে। আমি সব ঠিক করে' নিচ্ছি চঞ্চল, তুমি চুপ করে' সব দেখে' যাও।…আর রেজিংএর কথা বল্‌ছো, একটা খুন হ'ল বলেই কি আমি দমে' যাব ভেবেছ?…এখনও চাই, আরও বাড়াতে হবে রেজিং।…হেড-আপিসের তাড়া সইতে হয় আমাকেই, বুঝলে চঞ্চল?

চঞ্চল কিছু বুঝুক আর নাই বুঝুক, সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—তাই কর সাহেব।

পুলিশ আসিয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মড়া জ্বালাইবার হুকুম দিয়া গেল।

পরদিন 'মাইনস্ ইন্সপেক্টরের' কাছে দু' একটা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া, বৃদ্ধ-ম্যানেজার মিষ্টার জেমস্ হাসিতে হাসিতে তাহাকে বুঝাইয়া দিল, চুরি করিয়া বেশী কয়লা কাটিবার আশায় তারের বেড়া পার হইয়া টুইলা hang ng coal (ঝোলা কয়লা) কাটিতে গিয়া মরিয়াছে। সেখানে কাজ করিতে তাহাকে কেহই হুকুম দেয় নাই।

'মাইনস্-ইন্সপেক্টর'-সাহেব চলিয়া গেলে, মিষ্টার জেমস তাঁহার দন্তহীন মুখে খুব একচোট হাসিয়া লইয়া চঞ্চলকুমারকে গোপনে ডাকিয়া কহিলেন,—দেখলে চঞ্চল, এসব কাজে ভয় করলে চলবে কেন?……লাগাও, ফের রেজিং লাগাও,—কুছ পরোয়া নেই।

এ-সব কথা চঞ্চলকুমারের মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। মিষ্টার

জেম্‌সের কথা শুনিয়া, অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে-ই … লোকে এই বিপজ্জনক স্থানে কয়লা কাটিতে লাগাইয়া আসিয়াছিল এ… করিয়া দেখিতে গেলে, সে-ই সে হতভাগোর মৃত্যুর কারণ। টুইলা … মরিয়া গেল, কিন্তু তাহার স্ত্রী সোহাগী কি করিবে? তাহার তো নিজের বলিতে আর কেহই নাই! একটা ছেলে মেয়েও নাই, যাহাকে লইয়া সে বাঁচিয়া থাকে! এ দুঃসহ আঘাতের বেদনা সে সহিবেই বা কেমন করিয়া, আর জীবিকা উপার্জ্জনের জন্যই বা সে কি উপায় অবলম্বন করিবে?—এই-সব নানা কথা ভাবিয়া গত রাত্রিটা চঞ্চলকুমার বিনিদ্রভাবেই কাটাইয়াছে। হায় রে অভিশপ্ত কুলি-জীবন!

সাহেব সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া যাইতেছিল, চঞ্চলকুমার বলিল, —টুইলার স্ত্রীকে কিছু সাহায্য করলে হয় না?

সাহেব সজোরে পায়ের বুটটা মাটিতে আছড়াইয়া বলিল,—Damn your Twila, Babu! কোম্পানীর বাজে খরচ আমি হতে দিব না —জান? তুমি খাদে যাও, সে-সব দেখবার কোন দরকার নাই তোমার।

এ কথার উত্তরে চঞ্চলকুমার সাহেবকে বেশী কিছুই বলিতে পারিল না। যে হতভাগিনীর স্বামীকে কোম্পানীর স্বার্থের জন্য জানিয়া শুনিয়া হত্যা করা হইল, তাহাকে আজ এই দুর্দ্দিনে কিছু সাহায্য করা যদি কোম্পানীর বাজে খরচ হয়, তাহা হইলে কোম্পানীর আসল এবং সত্য ন্যায়ের খরচ যে কোন্ খানে, চঞ্চল সেইটাই ঠাহর করিতে পারিতেছিল না। কথাটা শুনিয়া তাহার রাগও হইল, ভাবিল, মনুষ্যত্ব-বিবর্জ্জিত এই ক্ষুদ্র সাহেবের দল নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য করিতে না পারে, এমন কাজ বোধ হয় দুনিয়ায় কিছুই নাই।

চঞ্চলকুমার ধীরে ধীরে বলিল,—খাদে না হয় গেলুম সাহেব, কিন্তু বলছিলুম কি, ওই মেয়েটা আজ থেকে খাবে কি ?

সাহেব বাহিরে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বলিল,—খাটবে, খাবে। তোমার তাতে কি ? You have nothing to do with it, চঞ্চল ! যাও, অনেক সময় নষ্ট করলে। এমন করলে কাজ চলবে না বলে' দিচ্ছি।

চঞ্চলের মুখ দিয়া আর কোন কথাই বাহির হইল না। সে ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া লাঠিটা তুলিয়া লইয়া খাদের দিকে চলিল।

চানকের নীচে নামিয়া খাদের ভিতর যাইতে তাহার মন সরিতেছিল না। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, অসহায়া সোহাগীর কথা। টুইলাকে যে সে-ই তের নম্বর কাঁথিতে কাজ করিতে বলিয়াছিল,—সে তো চুরি করিয়া কয়লা কাটিতে যায় নাই !

চঞ্চল ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই তের নম্বর গ্যালারির বেড়া-দেওয়া মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। গাঢ় অন্ধকার। লোকজন কেহই সেখানে নাই। দূরে কুলিরা কয়লা কাটিতেছে। কয়লা-কাটা গাঁইতির ঠং ঠং শব্দ, আর হৈ হৈ গোলমাল পিলারগুলার গায়ে প্রতিহত হইয়া অতি ক্ষীণ-ভাবে কানের কাছে আসিয়া বাজিতেছিল। টুইলা যেখানে মরিয়া পড়িয়াছিল, দূর হইতে সেই দিকে তাকাইতেই তাহার মনে হইল, তাহার মৃত আত্মা হয় তো এখনও সেই অন্ধকার স্থানটায় ঘুরিয়া ফিরিতেছে !...চঞ্চলকুমারের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল ! যদি টুইলা তাহার সম্মুখে আসিয়া বলে,—বল্ বাবু, আমাকে খুন করবার জন্যে কেন তুই সেখানে পাঠিয়েছিলি, বল্ ! আমি তো যেতে চাই নি !

দিন-মজুর

হঠাৎ সেই বেড়া-দেওয়া কাঁথির ভিতরে পায়ে চলার একটা থম্‌থম্‌ শব্দ হইতেই, তাহার বুকখানা ছ্যাৎ করিয়া উঠিল। ভয়ে তাহার মনে হইতেছিল, সেখান হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইয়া যায়, কিংবা চীৎকার করিয়া কাহাকেও ডাকে। কিন্তু না পারিল ছুটিতে, না পারিল কথা কহিতে। মাত্র একটু সরিয়া দাঁড়াইল। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিল, বেড়া ডিঙাইয়া কে একটা মানুষ অন্ধকারে তাহারই দিকে অগ্রসর হইতেছে। হাতের বাতিটা যে কোন্ সময় নিভিয়া গিয়াছে, তাহার সে খেয়াল নাই। তাড়াতাড়ি কম্পিতপদে পাশের একটা খোলা রাস্তার মধ্যে ঢুকিয়া চঞ্চল পিলারটা ধরিয়া দাঁড়াইল। চঞ্চলকুমারের মনে হইতেছিল, তাহার আর দাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই,—আজ হয় তো সে এইখানেই মরিয়া যাইবে। মরিবার পূর্ব্বে তাহার ইচ্ছা করিতেছিল, সে একবার প্রাণপণ চেষ্টায় ডাকে,—টুইলা! কিন্তু কণ্ঠে তাহার স্বর জোগাইল না! লোকটা কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে পা টিপিয়া টিপিয়া তাহার কাছে আগাইয়া আসিল। হাতের আলোটা নিভিয়া গিয়া চারি পাশের অন্ধকার তখন আরও জমাট মনে হইতেছিল।

চঞ্চল সেই অন্ধকারের মধ্যেই চক্ষু স্থির করিয়া দেখিতেছিল, লোকটা ক্রমেই তাহার নিকটে,—আরও নিকটে আসিতেছে! মুখে কথা নাই!

—বন্দ্ চলা কানা, টুইলা? (যাবি কোথা টুইলা?)—বলিয়া সে চঞ্চলকে ব্যাকুলভাবে হাত বাড়াইয়া জড়াইয়া ধরিতেই, তাহার সমস্ত শরীর অবশ হইয়া গেল।

এবং ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই একটা গ্যাস্ লাইটের তীব্র রশ্মি উভয়ের মুখের উপর আসিয়া পড়িল।......অ্যাঁ একি! চঞ্চলকুমার সবিস্ময়ে দেখিল—

যে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে সে টুইলার স্ত্রী সোহাগী। সোহাগীও দেখিল—তাহার মৃত স্বামী টুইলা বলিয়া যাহাকে সে ভ্রম করিয়াছিল, সে তাহাদেরই খাদের রেজিং-বাবু—চঞ্চলকুমার!

যে-লোকটা গ্যাস্-বাতি লইয়া তাহাদের মুখের উপর ধরিয়াছিল, সে লোকটা তাড়াতাড়ি সেখান হইতে সরিয়া গেল। চঞ্চলকুমার বুঝিল না—সে কে। বুঝিবার সময়ও ছিল না তাহার।

বিস্ময়াহতা সোহাগী লজ্জায় তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

কেমন করিয়া ঘটিয়া গেল, চঞ্চলকুমার সবই বুঝিল। কি যে তবু একবার জিজ্ঞাসা করিল,—তুই এখানে কেন সোহাগী?

ক্রন্দনরতা রমণী চোখের অশ্রু মুছিয়া কহিল,—কিছু মনে করিস্ না বাবু, আমি টুইলা মনে করেছিলাম তোকে।

সোহাগী চলিয়া যাইতেছিল; চঞ্চলকুমার বলিল,—তুই আজ কাজ করতে এসেছিস্ নাকি?

—কি করব বাবু, কে খেতে দিবেক্? গাড়ী বোঝাই দিচ্ছি উধারে।

আর কোন কথা না বলিয়া সোহাগী চলিয়া গেল।

চঞ্চলকুমার ভাবিল, সোহাগী নিশ্চয় গাড়ী বোঝাই দিতে দিতে টুইলা যেখানে মরিয়াছিল, সেই জায়গাটা লুকাইয়া একবার দেখিতে আসিয়াছিল। সোহাগী ভাবিতেছিল, যদি একবার মরিয়াও দেখা দেয় সে! তাই অন্ধকারে আমায় চলিয়া আসিতে দেখিয়া, সে টুইলা মনে করিয়া এই কাণ্ডটা করিয়াছে!......দুর্ভাগা নারী!

পকেটে যে দিয়াশলাই ছিল, চঞ্চলের এতক্ষণ সে-কথা মনেই ছিল না। আলোটা পুনরায় জ্বালিয়া লইয়া সে অন্যত্র চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে খাদ হইতে উঠিয়া আসিয়া চঞ্চলকুমার নিজের বাসায় বসিয়া ছিল। সম্মুখে দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তরের উপর, পশ্চিম আকাশে অস্তরবির করুণ রক্তিমা মেঘের স্তরে স্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। দূরে কয়েকটা কয়লাকুঠির বড় বড় 'পাল্লা,'। লাল ধূলার পাকা রাস্তার পরেই তাল তমাল আর মহুয়া বনের সারি!······কতকগুলা সাঁওতালী কুলি-ধাওড়ার উঠানে ইহারই মধ্যে আগুন জ্বালানো হইয়াছে। কয়েকটা ছাগল ঘাসের সন্ধানে প্রস্তরের উপর এদিক্-ওদিক্ ছুটিয়া বেড়াইতেছিল।

চঞ্চলকুমারের মনটা ভাল ছিল না।

মিষ্টার জেম্‌সের চাপরাশী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

—কে? দরাগ্ সিং?

—জি! চিঠ্‌ঠি হায় বাবু!

চিঠিখানা তাহার হাত হইতে লইয়া খুলিয়া পড়িতেই চঞ্চলকুমারের মুখখানা কেমন একরকম হইয়া গেল। সাহেব লিখিয়াছে,—

I am sorry. Your services are no longer required. I dismiss you and give you orders to be cleared up and leave Colliery within 24 hours.

দিন-মজুর

Herewith I send a slip to the Cashier who will pay you up.

You should not call for any explanation as I have seen you, with my own eyes, in the pit No. 5.

G. D. JAMES.

চঞ্চলের মুখ হইতে কিছুক্ষণ কোন কথা বাহির হইল না। বহু কষ্টে চেষ্টা করিয়া সে চাপ্‌রাশীকে বলিল,—যাও।

চঞ্চলকুমার ধীরে-ধীরে উঠিল। কতকগুলা তালগাছের সারির মধ্যে অস্তরবির শেষ রক্তিম রশ্মি তখন অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে।

চঞ্চলের মূল্যবান জিনিসের মধ্যে ছিল একটা চিঠির তাড়া। সমস্তগুলি একসঙ্গে গুছাইয়া একটা ব্যাগে পূরিল।

একবার মনে হইতেছিল, খাজাঞ্চি-বাবুর কাছে গিয়াও কাজ নাই। কিন্তু কি করিবে, নিঃসম্বল অবস্থায় কোথায় বা যাইবে সে!

সাহেবের চিঠিখানি দিবামাত্র খাজাঞ্চিবাবু চঞ্চলের বাকী পাওনা ষাটটি টাকা তাহার হাতে দিয়া একটা রসিদ লিখাইয়া লইল। চল্লিশ টাকা অগ্রিম লইয়া সে বাড়ী পাঠাইয়াছিল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকিয়া অতি সন্তর্পণে ব্যাগখানি মাত্র হাতে লইয়া, চঞ্চলকুমার বাহির হইল।...কোথায় যাইবে সে?

কয়লাকুঠির ময়লাঢাকা কালো রঙের ধূলার রাস্তার ধারে যে কুলি-

ধাওড়াটা ছিল, তাহারই একটা ঘরে সোহাগী থাকিত। একজন সাঁওতালের কাছে সন্ধান লইয়া চঞ্চল তাহারই দরজায় গিয়া উপস্থিত হইল। ডাকিল—সোহাগী!

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার পায়ের শব্দ পাইয়া একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছিল, সোহাগী বাহিরে আসিতেই কুকুরটা চুপ করিল।

চঞ্চল ধীরে-ধীরে পকেট হইতে পঞ্চাশটি টাকা বাহির করিয়া সোহাগীর হাতে দিতেই, সে চমকিয়া উঠিল। বলিল—এত টাকা কি হবেক, বাবু?

—রেখে দে, যতদিন চলে চালাস্। এখন খাদে খাটতে যাস নে।

সোহাগী বলিল,—কে দিলেক বাবু? কোম্পানী? না তুঁই?

চঞ্চল ভাবিল, নিজের নাম করিলে সে হয়ত এ পাপীর নিকট হইতে তাহার স্বামীর প্রাণের মূল্য গ্রহণ না করিতেও পারে, তাই বলিল,—হ্যাঁ কোম্পানী।

চঞ্চল সেখান হইতে দ্রুতপদে চলিয়া আসিল।......যুক্তকরে সেই অনাদি অনন্তের উদ্দেশে একটি নমস্কার করিয়া মনে-মনে কহিল,—হা ভগবান্! দাসত্বের পায়ে নিজের মনুষ্যত্বটুকু বিসর্জ্জন দিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছি, আমাকে সে পাপের শাস্তি দিতে তুমি কুণ্ঠিত হইও না। আমার আর কিছু বলিবার নাই।

চঞ্চলকুমার আম-বাগানের ভিতর অগ্রসর হইয়া রাস্তা ধরিল। কোথায় গেল, সে আর তাহার অন্তর্য্যামী ব্যতীত কেহই জানিল না।

পথিকহীন নিস্তব্ধ পথে সে যখন বহুদূর চলিয়া আসিয়াছে, তখনও

পশ্চাতে একটা কুলিধাওড়া হইতে গানের আওয়াজ তাহার কানে আসিয়া বাজিতেছিল, মাদল বাজাইয়া তাহারা নাচিয়া নাচিয়া গাহিতেছে—

বাবা ভোলা ভোলানাথ
সব কাজেই ক'রে বসে ভুল রে—
সব কাজেই ক'রে বসে ভুল !
ও তার হাতেতে ডমরু শিঙা
কানে গোঁজা ধুতুরারি ফুল রে
কানে গোঁজা ধুতুরারি ফুল !

প্রতিবিম্ব

আজ একটা কাহিনী বলিব।

বহুদিন পূর্ব্বের একটা ঘটনা মনে পড়ে। তখন আমি রাণীগঞ্জ ইস্কুলে পড়ি। একদিন শুনিলাম, ষ্টেশনের কাছে একটা সাঁওতালের মেয়ে রাত্রের মেল-ট্রেণে কাটা গিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহাকে দেখিতে ছুটিলাম। বহু লোকজনের ভিড় সরাইয়া আমরা কয়েকজন বন্ধু সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, মেয়েটার বয়স বেশি নয়। বোধকরি সতের-আঠারোর কাছাকাছি। কোমরের মাঝখানে কাটিয়া প্রায় দু'খণ্ড হইয়া গেছে। পুলিশে টানাটানি করিয়া সেই দ্বিখণ্ডিত মৃতদেহ লইয়া গেল দেখিলাম। তাহার পর কি হইল, সে সংবাদ লইবার প্রয়োজন হয় নাই।

আজ অনেকদিনের পর, আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে হাতে-লেখা একখানা ডায়েরী-বই পাইলাম। বন্ধু সেটিকে তাহার বইএর আলমারির এককোণে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। অন্যমনস্কের মত ডায়েরীর মাঝের কয়েকটা পাতা উল্টাইয়া পড়িতেই দেখিলাম, ট্রেণ, খুন, সাঁওতালের

মেয়ে, এই রকম কয়েকটা কথা রহিয়াছে। অনুমানে বুঝিলাম, এ সেই ট্রেণে-কাটা সাঁওতালের মেয়েটার কথাই হইবে-বা। সমস্ত ডায়েরীখানা পড়িবার দুর্দ্দমনীয় কৌতূহল মনে জাগিয়া উঠিল।

বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এটা আমায় একবার পড়তে দেবে?

তিনি বলিলেন, ও আমার এক দূর-সম্পর্কের দাদার ডায়েরী। গত বৎসর তিনি মারা গেছেন।—হাঁ, তুমি পড়তে পার।

কথায়-কথায় তাঁহারই কথা উঠিল। নাম,—শশাঙ্কশেখর চট্টোপাধ্যায়। বাড়ী, বর্দ্ধমানের কাছে কি-একটা গ্রামে। গ্রামের নামটা অবশ্য আজ আমার ঠিক স্মরণ হইতেছে না।

বন্ধু বলিলেন, দাদাটি আমার সারা জীবনের মধ্যে বিয়ে-থা করলেন না। কয়লা-কুঠিতে চাকরি কোরতে গিয়ে বেঘোরে প্রাণটা হারালেন।

—কি রকম শুনি?

বন্ধু হাসিয়া বলিলেন,—প্রেমের ব্যাপার হে! ছেলেবেলায় প্রেম করেছিলেন নীহার ব'লে একটি মেয়ের সঙ্গে। সেই প্রেম প্রেম ক'রেই গেলেন।

—প্রেমের জন্যেই বিবাগী হলেন বুঝি?

চোখ বুজিয়া গম্ভীরভাবে বন্ধু জবাব দিলেন,—হ্যাঁ। প্রায়ই তাঁকে বলতে শুনতাম, প্রেম নাকি তার সমস্ত মাধুর্য্য নিয়ে মানুষের জীবনে মাত্র একবার আসে। সে প্রেম যদি মিলনে সার্থক না হয় ত দ্বিতীয় প্রেমের জন্য অপেক্ষা করা মানুষের অন্যায়।

আর-কিছু শুনিবার প্রয়োজন ছিল না। ডায়েরীখানি হাতে লইয়া আমি বাহির হইয়া পড়িলাম।

দিন-মজুর

* *
*

আজ নিশীথ রাত্রে আমার নির্জ্জন গৃহে বসিয়া সেই অদ্ভুত ব্যক্তিটির জীবনের কাহিনী পড়িতেছি। তিনি ত' সংসার-সংগ্রামে বিজেতার জয়-মাল্য পরিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন। আজ তিনি কোথায় কোন্ অনির্দ্দেশ্য পরপারে রহিয়াছেন জানি না। যেথানেই থাকুন, বেদনার পূজারী সেই শশাঙ্ক শেখরের চরণোদ্দেশে কোটি কোটি নমস্কার করিয়া আজ তাঁহার স্বহস্তলিখিত জীবন-নাট্যের কয়েকটি দৃশ্য আপনাদের গোচর করিয়া দিলাম। যদি কোনও অপরাধ করিয়া থাকি, সে অপরাধের শাস্তি হাসিমুখে বরণ করিয়া লইব।

* * *

রাণীগঞ্জ
২৫শে অগ্রহায়ণ—

শীত এখানে মন্দ পড়ে নাই। সুদূর পশ্চিমের খনি হইতে রাণীগঞ্জের কাছাকাছি একটা কয়লাকুঠির বড়বাবু হইয়া আসিয়াছি। কোম্পানীর

দেওয়া 'কোয়ার্টারে' থাকিতে ইচ্ছা করি না। সেখানকার অর্দ্ধশিক্ষিত মদ্যপ এবং হীনচরিত্র যুবকদের সংসর্গ আমার ভাল লাগে না। যতদিন পর্য্যন্ত সে কদর্য্য মলিনতা হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নিরাপদ রাখিতে পারি,—মন্দ কি!

রাণীগঞ্জ শহরের এক প্রান্তে রেলওয়ে-ষ্টেশনের ধারে একখানি ছোট-খাটো বাসা ভাড়া করিয়াছি। কুঠি হইতে শহরে আসিবার কঙ্করময় অপ্রশস্ত রাস্তার ধারেই বাড়ীখানি,—সুমুখের জানালা খুলিলে নিকটেই রেলের লাইন দেখা যায়, তাহারই এক পার্শ্বে পুষ্পে লতায় সজ্জিত এক সাহেবের বাংলো এবং অনতিদূরে সুবিস্তৃত ধানের ক্ষেত। কর্ম্মস্থল এবং শহরের মাঝামাঝি এই স্থানটি আমার মন্দ লাগিল না।

নিজে 'কুকারে' রান্না করিয়া খাই—পাচকের প্রয়োজন হয় না। আমারই মতন গৃহহীন অবিবাহিত একটা 'কাহারে'র ছোক্‌রা—বন্‌শী, বহুদিন যাবৎ আমার সঙ্গেই আছে, কাজেই আমার অনাড়ম্বর গৃহের অন্যান্য যাবতীয় কাজকর্ম্ম বন্‌শীর দ্বারাই চলে।

২৮শে অগ্রহায়ণ—

রাত্রির ঘোর তখনও কাটে নাই। শয্যাত্যাগ করিলাম। শয়নকক্ষের সমস্ত দরজা জানালা খুলিয়া দিয়া মুক্ত বাতায়নপথে বাহিরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কিয়ৎকাল মৌন হইয়া বসিয়া রহিলাম। প্রত্যহ ঠিক এই সময়ে পশ্চিমযাত্রী একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেণ আমার বাড়ীর পাশ দিয়া

সশব্দে পার হইয়া যায়, পরক্ষণেই আবার পূর্ব্বের মত চারিদিক নিস্তব্ধ গম্ভীর হইয়া পড়ে। আজও ঠিক্ তাই! বন্‌শীকে ডাকিয়া উঠাইলাম। কূয়া হইতে সে জল তুলিয়া দিয়া 'ষ্টোভ' জ্বালিয়া চা করিতে বসিল। ঈষদুষ্ণ কূপের জলে স্নানাহ্নিক সারিয়া পুনরায় আমার শয়নকক্ষে ফিরিয়া গিয়া জানালার ধারে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিলাম। তখনও সেই শীত-প্রভাতে নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রকৃতি আমার মুখের পানে যেন তেমনি স্তব্ধ গম্ভীরভাবে তাকাইয়া আছে! বাহিরে গাঢ় শ্যাম শস্যক্ষেত্রের উপর কুজ্ঝটিকার ধূসর আবরণ ভেদ করিয়া বেশীদূর দৃষ্টি চলে না। অদূরে ধূম্রাচ্ছন্ন ঘন-গুল্ম-দুর্গম বনখণ্ডের মধ্য দিয়া কয়লাকুঠির দু'-একটা উন্নতশীর্ষ চিম্‌নির খানিকটা অংশ দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। বাংলোর সম্মুখে নানাবর্ণের পুষ্পমঞ্জরী-পরিশোভিত লতাবিতান, মনে হইতেছিল, যেন কোন্ শ্যামাঙ্গী সুন্দরী আমার চোখের সুমুখে ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছে।

প্রাতরাশ সমাপন করিয়া কুঠির উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িলাম। তখন লাইনের ধারে এবং শিশির-সিক্ত ধানের ক্ষেতের আলি-রাস্তায় নগ্নগাত্র দরিদ্র শ্রমজীবিদলের চলাচল সুরু হইয়াছে। শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে কেহ-বা গান ধরিয়াছে, কেহ-বা অনাগত দিবসের পরিশ্রমের বিনিময়ে অকিঞ্চিৎকর উপার্জ্জনের চিন্তায় বিবর্ণ-ম্লান মুখে পথ চলিতেছে। এ শ্রম যেন তাহাদের পণ্ডশ্রম। এ যেন তাহারা অন্যের জন্য করিতেছে। ইহাতে যেন তাহাদের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত সমর্থন নাই, সুখ নাই, আনন্দ নাই।

দেখিতে দেখিতে নবোন্মেষিত অরুণালোকে পরিস্ফুট হইয়া ধরিত্রী

জাগ্রত মুখরিত হইয়া উঠিল। স্বর্ণশীর্ষ শস্যক্ষেত্রে, পথিপার্শ্বস্থ শ্যামল শিশিরস্নাত বৃক্ষে-লতায়, পুষ্পে-পত্রে, রক্তাভ রবিরশ্মি বিচিত্রবর্ণে উজ্জ্বল হইয়া ঝল্-মল্ করিতেছে।

এই শান্ত সুন্দর নির্ম্মল প্রভাতে যেখানে চলিয়াছি, সেখানে যাহারা আমার সহকর্ম্মী, তাহাদের মনের মধ্যে আবিলতার আর অন্ত নাই. কেহ কাহাকেও ভালবাসে না, কাহারও সঙ্গে কাহারও প্রীতির সম্বন্ধ নাই, জানোয়ারের মত হিংস্র তাহারা সাপের মত ক্রূর। এই সব কথা ভাবিতে গিয়া মনে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিতেছিলাম। মনে হইতেছিল, যাহাদের মাথার উপরে এমন নির্ম্মেঘ নির্ম্মুক্ত স্বচ্ছ উদার নীলাকাশ,—অসীম বিস্তৃত এই আলোকোজ্জ্বল শ্যামা প্রকৃতি যাহাদের বেষ্টন করিয়া আছে,—সর্ব্বপাপঘ্ন মহাদ্যুতি এই অমলিন ভাস্কর যাহাদের সর্ব্বকর্ম্মের সাক্ষ্য, তাহাদের মনে এত আবিলতার কলুষ জমে কেমন করিয়া!

মধ্যাহ্নে 'আফিস' হইতে বাসায় ফিরিতেছিলাম। বন্‌শী হয়ত এতক্ষণ আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমার চোখের সুমুখে রেল-লাইনের কাছে এক সাঁওতাল-দম্পতি পার হইয়া যাইতেছিল। তাহাদের কথাগুলা শুনিতে পাইতেছিলাম; কিন্তু বুঝিবার ক্ষমতা নাই। মেয়েটি একবার আমার দিকে চাহিয়া যুবককে কি-যেন বলিল। যুবক ঈষৎ হাসিল মাত্র। মেয়েটি ঝুঁকিয়া পড়িয়া পথের ধারের ঝোঁপ হইতে একটা লাল ফুল তুলিয়া যুবকের কোঁকড়ানো লম্বা চুলের ফাঁকে গুঁজিয়া দিল। যুবক হাত দিয়া মাথার চুলগুলা একবার ঝাড়িয়া দিতেই ফুলটি মাটিতে পড়িয়া গেল। মেয়েটি এবার একগোছা লম্বা ঘাস ছিঁড়িয়া তাহার মাথায় গুঁজিয়া দিয়া ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

তাহারা চলিয়া গেল। আমি আবার পশ্চাৎ ফিরিয়া এই অনার্য্য-দম্পতিকে দেখিলাম! বড় ভাল লাগিল। মানুষের কখন্ যে কাহাকে ভাল লাগে কিছুই বুঝিবার উপায় নাই।

বাসায় ফিরিয়া দেখি, বন্‌শী রন্ধনের সরঞ্জাম সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। 'কুকারে' আগুন দিয়া চুপ করিয়া বসিলাম। সাহেবের বাংলোর দিকে দৃষ্টি পড়িল। বাগানের কয়েকটা মরসুমি ফুলের গাছ পুষ্পসম্ভারে এবং বর্ণ-বৈচিত্র্যে অপূর্ব্ব শ্রী-মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। আজ এই রৌদ্র-ঝলসিতা ধরিত্রীর মাঝে, নিতান্ত অসময়ে বোধকরি পথ ভুলিয়া বসন্ত আসিয়াছে! বন্‌শীকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম,—তুই কখনও কাউকে ভালোবেসেছিস্ বন্‌শী?

সহসা অপ্রতিভ হইয়া গিয়া বন্‌শী একটুখানি হাসিল মাত্র।

বহুদিন পরে, আজ আবার আমার মনে হইল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমিই শুধু নিঃসহায়, নিঃসঙ্গ, নির্লিপ্ত,—সুদূর!

২রা পৌষ—

*   *   *   কোন কাজ ছিল না,—আজ দুপুরে একটু সকাল-সকাল আফিস হইতে বাসায় ফিরিলাম। সদর দরজার চৌকাঠ পার হইয়া দেখিলাম, উঠানের উপর রৌদ্রের দিকে পিছন ফিরিয়া বন্‌শী ছুরি দিয়া আমার তরকারী কুটিয়া রাখিতেছে এবং তাহার পাশেই কালো একপিঠ চুল এলাইয়া চওড়া-পেড়ে একখানা সাড়ী পরিয়া একজন

স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। আমার জুতার শব্দে উভয়েই চমকিয়া মুখ ফিরাইল। মেয়েটিকে দেখিয়াই চিনিলাম, সাঁওতালের মেয়ে। বয়স আন্দাজ সতের-আঠারোর বেশি হইবে না। কিন্তু বুঝিলাম না, হঠাৎ আজ আমার এ-বাসায় তাহার আবির্ভাব হইল কেন, এবং বন্‌শীর সঙ্গে তাহার এত ঘনিষ্ঠতাই বা হইল কেমন করিয়া! কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া আমি ঘরে প্রবেশ করিলাম। একবার ভাবিলাম, বন্‌শীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি; আবার ভাবিলাম প্রয়োজন নাই।

কাপড় জামা ছাড়িয়া বসিলাম। অন্যদিনের মত আজও বন্‌শী আমার 'কুকার' এবং রন্ধনের অন্যান্য সরঞ্জাম ঘরের মেঝের উপর নামাইয়া রাখিতে লাগিল। মুখে কিছু না বলিলেও তাহার ভাব-গতিক দেখিয়া মনে হইল, সে যেন ভাবিতেছে, বাবু মনে কি করিলেন কে জানে!

জিজ্ঞাসা করিতেই সে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বলিলাম, মেয়েটা কে রে?

বন্‌শী তাড়াতাড়ি হাতের ইসারা করিয়া তাহাকে ডাকিল, এই দলিয়া, আয়!

আমি বলিলাম, না রে ওকে ডাকিনি, কে তাই জিজ্ঞেস কর্‌ছিলুম।

বন্‌শী বলিল, উ নিজেই বলুক্ না! আমার কাছে রোজ একবার কোরে আসে। আমি বলছি, বাবুর এখানে চাকরি মিলবে না,—তবু শোনে না।

দেখিলাম, দরজার পার্শ্বে দলিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। হরিণের মত দুটি নিবিড় কালো চোখে নির্ভীক চাহনি, সর্ব্বাঙ্গে যৌবন-শ্রী।

দিন-মজুর

জিজ্ঞাসা করিলাম, তোর বাপ-মা কোথায় থাকে ?

দলিয়া একবার আমার পানে তাকাইয়া বলিল, কেউ নাই। মরেছে সব।

—থাকিস্ কোথায় ?

—'খাঁড়্গুলি'তে ছিলম্ এদ্দিন্।

—কি কাজ করতিস্ ?

—বাসন মাজথম্।

—ছেড়ে' দিলি কেন ?

—অত-সব জানি না বাবু, তুঁই কাজ দিবি ত' দে !

—কয়লা-খাদে কাজ করবি ?

ঈষৎ হাসিয়া দলিয়া বলিল, তা হ'লে তুরু লেহরু* করব কিসকে ?

—কেন, খাদে ত' তোদের সবাই কাজ করে।

হেঁটমুখে দলিয়া উত্তর দিল, খাদের বাবুরা ভারি বজ্জাৎ।

এখানে হবে না তুই আর-কোথাও দ্যাখ—বলিয়া আমি 'কুকারে' বাটিগুলা সাজাইতে বসিলাম। দলিয়া সকরুণ দৃষ্টিতে একবার বনশীর দিকে তাকাইল। বন্শী ওকালতি করিতে ছাড়িল না। নিজে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আমায় বুঝাইয়া বলিল যে, সে যখন বলিতেছে, তাহার কেহ কোথাও নাই, তখন তাহাকে এখানে রাখা উচিত, কিন্তু আমাদের দরকার যখন নাই......

আমি বলিলাম, আমার এমন কি কাজ বনশী যে আবার একটা ঝি রাখতে হবে ?

---

* খোসামোদ

বন্‌শী চুপ করিয়া রহিল। দলিয়া কোনও কথা না বলিয়া ধীরে-ধীরে বাহির হইয়া গেল।

আমি মুখ নীচু করিয়া তরকারিতে মসলা মাখাইতেছিলাম। বলিলাম,—তুই কি বলিস্ বন্‌শী ?

কোনও উত্তর না পাইয়া তাকাইয়া দেখি, সেও কখন্ বাহির হইয়া গেছে।

হঠাৎ কি জানি কেন, রাগ হইল। জোরে হাঁকিলাম, বন্‌শী !

সে সত্রস্তে আসিয়া দাঁড়াইতেই বলিয়া উঠিলাম, কোথায়, গিয়েছিলি কোথায় ?—আগুন ধরিয়েছিস্ ?

—এই যে আনি,—বলিয়া সে ছুটিল। জানালার ফাঁকে তাকাইয়া দেখিলাম, আগুন-সমেত লোহার উনানটা লইয়া ফিরিবার সময় বন্‌শী বারবার সদর দরজার দিকে চোরা-দৃষ্টি হানিতেছে। মেয়েটা বোধকরি তখনও দাঁড়াইয়াছিল। একবার হোঁচট খাইয়া আসন্ন পতন হইতে বন্‌শী নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইল।

আমার হাসি পাইতেছিল, কিন্তু হাসিতে পারিলাম না। হাসিতে গিয়া কোথায় যেন ব্যথা বাজিল। * * *

৩রা পৌষ—

* * * আজও দলিয়াকে দেখিয়াছি। অন্য-দিন ফিরিতে প্রায় রাত্রি হইয়া যায়। আজ শনিবার। শীতকালের

দিন-মজুর

বেলা তখন শেষ হইয়া আসিয়াছে। দূরে,—রেল-লাইনের উপরে এবং ধানের ক্ষেতে সন্ধ্যা নামিয়াছে। আমার বাসা হইতে বাহির হইল কি না জানি না, দলিয়াকে এই রাস্তায় চলিয়া যাইতে দেখিলাম।

৪ঠা পৌষ—

আজ রবিবার। আমার অফিস ছুটি। * * * বেলা তখন প্রায় দশটা। ভাবিতেছিলাম, দিনটা এমন নির্ব্বান্ধব অবস্থায় কেমন করিয়া কাটিবে! এমন সময় দেখিলাম, বাহিরে কুঠি হইতে শহরে যাইবার রাস্তাটার ধারে, আমার বাসার দরজার ঠিক সম্মুখে একটা কুল-গাছের তলায় দলিয়া কি যেন খুঁজিতেছে। সেদিন আমার ঘরে দলিয়াকে ঠিক যেরকমটি দেখিয়াছিলাম, আজ উহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, এ যেন সে নয়; এ যেন সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র রমণী। চুলগুলা উস্কো-খুস্কো হইয়া গেছে, মুখের চেহারা, পরিধেয় বস্ত্র, সমস্তই যেন বিবর্ণ, মলিন। বেচারার উপর বড় দয়া হইল। ডাকিলাম, দলিয়া!

সে একবার মুখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিল, পরক্ষণেই আবার অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া নিজের কাজে মন দিল।

বন্‌শী এইমাত্র বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে বলিলাম, ওরে বন্‌শী, তোর দলিয়া এসেছে।

বন্‌শী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া আমার দরজার বাহিরে দাঁড়াইল। আবার বলিলাম, বন্‌শী, দলিয়াকে ডেকে নিয়ে আয়—বল্‌, চাকরি দেবো।

সে তখনও তেম্‌নিভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। আমার মুখ দিয়া যে এরূপ আজ্ঞা বাহির হইতে পারে তাহা সে বিশ্বাস করিল না।

বলিলাম, যা বন্‌শী, আমি কি তোর সঙ্গে তামাসা করছি?

এতক্ষণে বন্‌শী সাহ্লাদে বাহির হইয়া গেল এবং পরক্ষণেই দলিয়াকে লইয়া ফিরিয়া আসিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি রে দলিয়া, চাকরি পেয়েছিস্?

মাথা নাড়িয়া দলিয়া জানাইল, উঁ-হুঁ।

—কাল পরশু কোথায় ছিলি?

—ইষ্টাশনে।

—মোট বইছিলি বুঝি?

—না।

—কি খেয়েছিস্?

—কিছুই না।

'কুকারে' তিনজনের খাওয়া চলে না। বন্‌শীকে বলিলাম, বাজার থেকে চাল, ডাল এনে তোরা বাপু আলাদা রান্না করে' খা। আমি আর হাজার জনের রাঁধতে পারবো না।

বলিতে-না-বলিতে 'বেশ বাবু' বলিয়া বন্‌শী বাজারে ছুটিল। দলিয়াও চলিয়া যাইতেছিল। আমি বলিলাম, যাস্ না দলিয়া, আজ থেকে তুই আমার কাছেই থাক্।

সে একবার আমার মুখের পানে তাকাইয়া আবার মুখ নত করিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তুই বিয়ে করেছিস্ দলিয়া?

৫ই মাঘ—

*   * সীতারামপুর ষ্টেশনের কাছে কি-একটা কয়লার খনিতে বন্‌শীর এক দূর-সম্পর্কের মাসী থাকে। বন্‌শী বলিল, আজ যদি সকালের ট্রেণে গিয়া বৈকালে তাহাকে লইয়া আসে, তাহা হইলে বিবাহের অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য সে-ই সমস্ত ঠিক করিয়া দিবে।

বলিলাম, সাঁওতালের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে সে যদি তোর না দিতে চায়?

ঈষৎ হাসিয়া বন্‌শী আমাকে বুঝাইয়া দিল যে, তাহার মাসী এবং মেসো দেশ হইতে আসিয়া মুসলমান হইয়াছে। সে জন্য কোনও চিন্তা নাই এবং তাহারা যখন গরীব মানুষ, তখন দু'দশটাকা হাতে দিলেই আর কিছু গোলমাল থাকিবে না।

তাহাকে দশটি টাকা দিয়া বলিয়া দিলাম, যদি না আসতে চায় তা হ'লে না হয় না আসবে। তুই চলে' আসিস্ যেন।

বন্‌শী ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া বাহির হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে দলিয়া ছুটিতে ছুটিতে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, উ বল্লেক্, সীতারামপুরের হাটে ভাল সাড়ী পাওয়া যায় বাবু!

তাহার হাতে আরও দশটি টাকা দিয়া বলিলাম, দু'জোড়া আন্‌তে বলে দে।

সে খুশী হইয়া বন্‌শীর হাতে তাহার সাড়ীর দাম দিতে চলিয়া গেল।

বেলা সাড়ে-ন'টার সময় সীতারামপুর যাইবার পশ্চিমের ট্রেণখানা

পার হইয়া গেল। জানালার কাছে সরিয়া আসিয়া দেখিলাম, দলিয়া লাইনের ধারে একদৃষ্টে বস্‌শীর দিকে তাকাইয়া আছে!

বৈকালে বন্‌শীর ফিরিবার তুই খানা ট্রেণ চলিয়া গেল, কিন্তু বন্‌শী আসিল না দেখিয়া দলিয়া ও আমি ভাবিতে লাগিলাম।

দলিয়া এ-বেলা নিজেই রান্না করিয়াছিল। বন্‌শীর জন্য একথালা ভাত ঢাকা দিয়া সমস্ত শীতের রাত্রিটা সে উৎকর্ণ হইয়া জাগিয়াই কাটাইল। পূর্ব্ব এবং পশ্চিমযাত্রী যতগুলা ট্রেণ সশব্দে আমার বাড়ীর পাশ দিয়া পার হইয়া গেল, ততবারই দলিয়ার দরজা খোলার শব্দ পাইলাম। * * *

৬ই মাঘ—

অতি প্রত্যূষে দলিয়া আজ নিজেই আমার স্নানের জল তুলিয়া দিল। চা খাইয়া আজও প্রতিদিনের মত আফিসে যাইবার জন্য বাহির হইতেছি, দেখিলাম, দরজার চৌকাঠের উপর বসিয়া দলিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কান্না সুরু করিয়াছে। তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম, সে নিশ্চয়ই আসবে,—তুই কাঁদিস না।

চোখ মুছিয়া আমার পানে একবার তাকাইয়া দলিয়া বলিল, না বাবু, সে আর আস্‌বেক্ নাই।

শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব বলিয়া বাজারের একটি টাকা তাহার হাতে দিয়া আমি চলিয়া গেলাম।

দিন-মজুর

দুপুরে অফিস হইতে ফিরিবার পথে দেখিলাম, লাইনের ধারে পাগলিনীর মত আলুলায়িতকেশা দলিয়া কাণ পাতিয়া দূরে ট্রেণের শব্দ শুনিতেছে।

একটা ধমক দিয়া বলিলাম, রৌদ্রে বসে' এ কি হচ্ছে দলিয়া, বাড়ী চল্!

দলিয়া মাথার চুলগুলা একবার দোলাইয়া কহিল, এইবারে যে গাড়ীটো আস্‌বেক্, সেইটো দেখি। আস্‌বেক্ হয়ত।

এ উন্মাদিনীকে আর কি বলিয়া বুঝাইব? বাসায় ফিরিয়া দেখিলাম, বাজার হইতে আমার জন্য সে সমস্তই আনিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু তাহার নিজের জন্য উনানটা পর্য্যন্ত ধরায় নাই।

দিনের ট্রেণে বন্‌শী ফিরিল না। রাত্রেও তাহার দেখা নাই।

দলিয়ার এক দণ্ডের জন্য বিশ্রাম নাই। সমস্ত দিন অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় ছটফট করিতেছে। অনেক করিয়া তাহাকে কিছু খাওয়াইতে পারিলাম না।

প্রত্যূষে উঠিয়া দেখি, সদর দরজা খুলিয়া দলিয়া কোন্ সময় বাহির হইয়া গেছে। ভাবিলাম, সে নিশ্চয় লাইনের ধারে বসিয়া আছে। জল তুলিয়া দিবে বলিয়া তাহাকে ডাকিতে গেলাম।

লাইনের উপর লোক-জনের বিরাট জনতা দেখিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। দেখিলাম দুই খণ্ডে বিভক্ত দলিয়ার রক্তাক্ত শবদেহ ঘিরিয়া লোক জড়ো হইয়াছে। তাহার সেই যৌবন-দীপ্ত শান্ত সুকুমার মুখের পানে তাকাইতে পারিতেছিলাম না। তাহার সেই মৃত্যুমলিন অপলক দুটি চক্ষের অনিমেষ চাহনি তখনও যেন আশা আকাঙ্ক্ষায় অস্থির

চঞ্চল হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে,—প্রণয়ীর আগমন-প্রতীক্ষায় উদ্বিগ্ন কাতর সে মুখখানির দিকে তাকাইতে গিয়া চোখে আমার জল আসিল।

৭ই মাঘ—

দলিয়ার মৃতদেহ 'মর্গে' লইয়া গেল। আমাকে লইয়া টানাটানি হইবে জানি, কাজেই তৎক্ষণাৎ থানায় গিয়া ইন্‌স্পেক্টরবাবুকে সমস্ত পরিচয় দিয়া বলিলাম, ডাক্তারবাবুকে দয়া করিয়া নিষেধ করিয়া দিন, ও অভাগীর অতৃপ্ত বুকের ওপর ছুরি যেন আর না চালানো হয়।

অনেক কষ্টে দলিয়ার শবদেহ দাহন করিবার অনুমতি পাইলাম।

কুঠির লোকজন লইয়া দামোদরের শ্মশানে যখন তাহাকে শেষ করিয়া দিয়া বাসায় ফিরিলাম, রাত্রি তখন প্রায় নয়টা।

সমস্ত দিন অনাহারে কাটিয়াছে। রাত্রিটাও কাটিবে।

শহরের এই নিরালা প্রান্তে আমার ক্ষুদ্র বাসার অপ্রশস্ত প্রাঙ্গণটুকুর মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত অন্ধকার যেন জমাট বাঁধিয়াছে! প্রণয়ীযুগলের হাসি-গানে, মিলন-বিরহে, আনন্দে-নিরানন্দে যেখানে আমি মাসাবধি-কাল মায়া-স্বর্গ রচনা করিয়াছিলাম, আজ এই নীরব নিস্তব্ধ বিভীষিকাময়ী শীতরাত্রে হঠাৎ সে স্বর্গলোক শ্মশানে পরিণত হইল।

৮ই মাঘ—

গত রাত্রে সেই-যে লেপ-মুড়ি দিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম, তাহাদের কথা আর ভাবিব না, কিন্তু রাত্রে যে

বিজয়িনী

চৈত্রের খর-রৌদ্র-দগ্ধ প্রান্তরের পাশ দিয়া শীর্ণ সিঙ্গারণ নদীর স্বচ্ছ জলটুকু ঝির্ ঝির্ করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। দুই পার্শ্বে পুষ্পিত পলাশ-বনের মাঝে, দু'একটা কয়লা-কুঠির 'পাল্লা' মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঘন পত্র-পল্লবে-ঢাকা অসংখ্য রক্ত-রাঙা ফুলের আড়ালে কয়েকটা কোকিল ক্রমাগত ডাকিতে শুরু করিয়াছে। এই রৌদ্র-ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করিয়া, সাঁওতাল-যুবতী ভুলি, কোকিল-ডাকা প্রান্তরের উপর চলিতে চলিতে একটা গাছের ছায়ায় বসিয়া পড়িল। তাহার সুস্থ সবল দেহে যৌবনের উন্মাদনা, পরণে একখানা চওড়া-পাড় তাঁতের মোটা সাড়ি, মাথায় দোলন-খোঁপার মাঝে মাঝে রক্ত-পলাশ।

মাথার উপর রৌদ্রের রুদ্র খরতাপে চারিদিকের গাছপালাগুলা ঝলসিয়া পুড়িতেছিল, পায়ের নীচে ধরিত্রীর তপ্ত বুকের উপর চলাচলের সরু পথটুকু তাতিয়া আগুণ হইয়া উঠিয়াছে। ভুলি উঠিয়া দাঁড়াইল। অদূরে কয়েকটা কাটা ধানের ক্ষেতের পারে, শ্যাওড়া, তাল, হিন্তাল ও

হিজল্ গাছের ফাঁকে বাবুদের গাঁয়ে, বাসন্তী-মন্দিরের চূড়া দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। কোন রকমে তাহাকে সেখানে পৌঁছিতেই হইবে। গত তিন চার দিন ধরিয়া সেখানে বাসন্তীপূজা উপলক্ষে নাচ, গান, যাত্রা, কবি ইত্যাদি হইতেছে। কিন্তু যাই যাই করিয়াও সে যাইতে পারিতেছিল না। আজ যদি টুব্নীকে তাহার স্বামীর সহিত বসিয়া সেখানে 'কবি' শুনিতে দেখে, তাহা হইলে সে দু'য়ের মধ্যে একজনকে খুন করিয়া আসিবে। হোক্ না টুব্নী তাহার এক মায়ের পেটের বোন্, তাহা হইলেও আর সে তাহার অন্যায় স্পর্দ্ধা এবং ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিতে পারিবে না। তাহার স্বামী পীরু-মাঝির সহিত যেখানে-সেখানে আসা-যাওয়া, মেলা-মেশা এবং ভালবাসার ভিতর দিয়া টুব্নীর নামে লোকমুখে যে কুৎসাটা দিন দিন রটিয়া উঠিতেছিল, তাহা শুনিলে কানে আঙুল দিতে হয়। অবিবাহিতা টুব্নীর নামে এ নিন্দাবাদ রটানোর জন্য লোককেও তো দোষ দেওয়া যায় না! কারণ, বাসন্তীপূজার প্রথম দিন হইতে সেই যে টুব্নীকে লইয়া পীরু তাহাদের ধাওড়া ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে,—আজ পর্য্যন্ত ফিরিবার নাম নাই! তাহারা ফিরিয়া আসিবে ভাবিয়া ভুলি তাহাদের জন্য ভাত পর্য্যন্ত রাঁধিয়া রাখিয়াছিল কিন্তু অবশেষে লোক অভাবে সে-ভাত কুকুরকে খাওয়াইতে হইয়াছে।

রাগের ঝোঁকে নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে ভুলি তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পৌঁছিল। পথের দুই পাশে টিনের চালা বাঁধিয়া কয়েকটা খাবারের দোকান বসিয়াছে, মাথার উপর কাপড়ের পর্দ্দা টাঙাইয়া কোথাও বা 'ঝাণ্ডি' খেলা সুরু হইয়াছে, কাচের চুড়ি বিক্রেতাদের দোকান ঘিরিয়া মেয়েদের ভিড়! পান, বিড়ি ও

সর্‌বতের দোকানগুলা ত' লোকে লোকারণ্য! বাসন্তী-মন্দির-সংলগ্ন সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে যাত্রাগান চলিতেছিল,—সেখানেও অসংখ্য নরনারী! এই বিরাট জন-সমুদ্রের মধ্য হইতে ভুলি কেমন করিয়া পীরু ও টুবুণীকে খুঁজিয়া বাহির করিবে, সেই কথাই ভাবিতে ভাবিতে সে অগ্রসর হইয়া গেল। দেখিল, তাহাদেরই কুলি-ধাওড়ার একটা সাঁওতালের মেয়ে স্বামীর হাত ধরিয়া এককোণে দাঁড়াইয়া আছে;—মেয়েটার হাতে লাল কাগজের একটা 'ফিরফিরি' বাতাসের জোরে অগ্নি-শিখার মত ঘুরিতেছিল। তাহার কাছে গেলে হয়ত টুবুণীর খবর পাওয়া যাইবে ভাবিয়া, ভুলি লোকের ভিড় সরাইয়া প্রাণের উদ্বেগে সেইদিকে চলিতে লাগিল।

চারিদিকের হট্টগোলে যাত্রাগানের একটি মাত্রাও কেহ বুঝিতেছিল কি না সন্দেহ। বাবুদের কয়েকটা ছেলে, চাপরাশী লইয়া কোলাহল থামাইবার চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময় ভুলিকে এইরূপ ভাবে লোক সরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, চশমা-পরা একটা ছোকরার উদ্যত বেতখানা ভুলির পিঠের উপর সজোরে আসিয়া পড়িল। যন্ত্রণায় অধীর হইয়া ভুলি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, ছোকরা বলিতেছে,—বোস্ ওইখানে, এগিয়েছিস্ কি মারের চোটে পিঠের চামড়া তুলে' দেব।

রাগে ও অভিমানে ভুলির চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া আসিতেছিল ছলছল-চোখে বাবুটির মুখের পানে একবার তাকাইয়া সে সেইস্থানেই বসিয়া পড়িল। বাবুদের ছেলে,—বলিবার কিছুই নাই। নহিলে হয়ত' তাহার কাঁকনের একটি আঘাতে তাহার মত পাঁচটা জোয়ানকে ভুলি এক সঙ্গে ঘায়েল্ করিয়া দিতে পারে।

যাত্রার লোকগুলা জম্‌কালো পোষাক পরিয়া আসা-যাওয়া করিতে-

ছিল। জলভরা চোখের ঝাপসা দৃষ্টি দিয়া ভুলি তাহাদের বেশ ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছিল না, তাছাড়া তাহাদের বক্তৃতার ভাষাটা তাহার কাছে হেঁয়ালির ছন্দের মত বোধ হইতেছিল। ধীরে ধীরে চোখের জল মুছিয়া ভুলি সেখান হইতে উঠিতে যাইবে, এমন সময় দেখিল, এক আলু-লায়িতকেশা রমণী বক্তৃতা করিতে করিতে ছুটিয়া আসরের মধ্যে প্রবেশ করিল; তাহার বাম হস্তে উদ্যত তরবারি। ভুলি ভাবিল, সে যদি আজ এমনি একটা ধারালো তলোয়ার হাতে পাইত, তাহা হইলে গায়ের জোরে দুনিয়ার সমস্ত বাধা-বিপত্তি এড়াইয়া হয়ত' সে তাহার প্রিয়তম পীরুকে জয় করিয়া নিজের কাছে টানিয়া আনিতে পারিত। ভুলি আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। সেখান হইতে অতি অন্তর্পণে উঠিয়া লোকের ভিড় ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। রৌদ্রে পথ চলিয়া পিপাসায় তাহার কণ্ঠ-তালু শুকাইয়া গিয়াছিল। একটা সরবতের দোকানে গিয়া বলিল, এই! দে এক পয়সার!

সরবৎ-বিক্রেতা মুখ বিকৃতি করিয়া বলিল,—যাঃ, এক পয়সার সরবৎ মিলে না।

—তবে কৎকে দিবি?

—চার পয়সা।

'তাই দে' বলিয়া অঞ্চলের প্রান্ত হইতে চারিটি পয়সা বাহির করিয়া ভুলি তাহার হাতে দিল।

বরফ-দেওয়া সরবৎ মুখে দিতেই ভুলির সর্ব্বাঙ্গ জুড়াইয়া গেল। বলিল, —বাঃ, ই যে বড কালা!

ভুলি সরবতের গ্লাসটা ঢক্ ঢক্ করিয়া এক নিশ্বাসে পান করিয়া কিছু

ক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। আসা-যাওয়ার সরু পথের পানে এক একবার কটাক্ষ হানিয়া দেখিয়া লইতেছিল যদি টুমুণী ও পীরুকে হঠাৎ দেখিতে পাওয়া যায়!

হঠাৎ সে একটা লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল,--হাঁ হে, কবি কোথা হচ্ছে?

লোকটা বলিল,—ইস্কুলের মাঠে।

ভুলি সেই দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। আকাশ জুড়িয়া একটা কালো মেঘ উঠিয়াছিল। ঝড়ের বেগে পথের ধূলা উড়িয়া পথযাত্রী লোকগুলাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। কোনরকমে চোখে কাপড় ঢাকা দিয়া কিয়দ্দূর আসিতেই ঝড়ের বেগ থামিল। উত্তরদিকের আকাশে বিদ্যুৎ ঝিলিক মারিতেছিল। পশ্চিম-আকাশের খানিকটা তখন রবিরশ্মির বর্ণ-সমারোহে লাল হইয়া উঠিয়াছে। কয়েকটা তাল গাছের ফাঁক দিয়া অস্তমান সূর্য্যের রক্তিম ছটা সুমুখে বাঁশ গাছের পাতায় পাতায় ঝিক্-মিক্ করিতেছিল!

ঢুলির আওয়াজ কানে যাইতেই ভুলি বুঝিল, ইস্কুলের মাঠ সেখান হইতে বেশী দূরে নয়। যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে ভুলি সেখানে পৌঁছিয়া দেখিল, কবির তর্জ্জা আরম্ভ হইয়াছে এবং সাঁওতাল ও বাউরী শ্রোতাগণ মনোযোগ দিয়া শুনিতেছে।

কিঞ্চিৎ আশা হইল। এদিক-ওদিক দেখিতে দেখিতে হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল, পীরু ও টুমুণী পাশাপাশি বসিয়া একমনে [illegible] করিতেছে। ভুলি তাহাদের কাছে আগাইয়া গেল। গিয়া ডাকিল, টুরণী শোন্, উঠে আয়!

টুরণী উঠিয়া আসিল। পীরু ভুলিকে দেখিতে পাইয়াও কোন কথা কহিল না,—যেন দেখিতে পায় নাই, এইরূপ ভান করিয়া 'কবি' শুনিতে লাগিল।

টুরণীকে লোকজনের গোলমাল হইতে কিছুদূরে লইয়া গিয়া, ভুলি সজোরে ঠাস্ করিয়া তাহার গালে এক চড় বসাইয়া দিয়া বলিল,—লজ্জা লাগে না টুরণী? তোর দায়ে আমার যে মুখ পুড়ে' গেল!

চড় খাইয়া টুরণী রাগিয়া উঠিল। বলিল,—বেশ করব, তুর কি?

ভুলি তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—বেশ করবি? করলেই হ'লো কি না!···আয় তুই ঘরকে আয়, তোকে খুন্ করব আমি।—বলিয়া তাহাকে হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া কিয়দ্দূর লইয়া গেল।

টুরণী চীৎকার করিয়া উঠিল, পীরু! পীরু!

পীরুর নজর ছিল তাহাদেরই দিকে। টুরণী ডাকিতে না ডাকিতে, পীরু হাজির হইল। কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া পীরু ভুলির চুলের মঠি ধরিয়া সজোরে টানিয়া পিঠের উপর লাথি মারিতে আরম্ভ করিল।

মার খাইয়া ভুলি তাহার স্বামীর মুখের পানে সকরুণ দৃষ্টিতে একবার তাকাইল, তাহার পর ধীরে-ধীরে তাহার একান্ত সন্নিকটে সরিয়া আসিয়া বলিল,—লে, কত মারতে পারিস্ মার্ খাল্‌ভরা!···মেরে মর্ঁাই দে কেনে, খালাস্ পাই তাহেলে।

বাবুদের একজন চাপ্‌রাশী শান্তিরক্ষার জন্য দূরে দাঁড়াইয়াছিল। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া বিবাদ মিটাইয়া দিল।

টুবুণীকে লইয়া পীরু পুনরায় গান শুনিতে বসিল। ভুলি আর-একবার সজল চক্ষে তাহাদের পানে তাকাইয়া মুখ বুজিয়া বাড়ী ফিরিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে উৎসবের কলরোল তাহার কানে প্রেত-পিশাচের আর্ত্ত চীৎকারের মতই বাজিতে লাগিল।

যে-কাজ করিবার জন্য ভুলি, রৌদ্র-ঝঞ্ঝা মাথায় করিয়া ক্রোশখানেক পথ হাঁটিয়া ছুটিয়া গিয়াছিল, সে কাজ ত হইলই না, তাহার উপর রাত্রি আটটার সময় ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া সে ধাওড়ায় ফিরিয়া আসিল। ধাওড়ার প্রায় সকলেই নাচ গান শুনিতে গিয়াছে, মাত্র দু'চার জন পুরুষ ও রমণী রাত্রে যাইবে বলিয়া তখন হইতে উদ্যোগ করিতেছিল।

স্বামীর কাছ হইতে যে এরূপভাবে নির্য্যাতিত হইয়া আসিতে হইবে, এ কথা ভুলি মনে করিতে পারে নাই। টুবুণী যদি না কাছে থাকিত, তাহা হইলেও-বা এ নির্য্যাতন সে অক্লেশে সহ্য করিতে পারিত, কিন্তু এতগুলা লোকের সাক্ষাতে অপমান – ছি, ছি, অসহ্য!

ভুলি যে-ঘরটায় থাকিত, তাহারই খান-পাঁচ-ছয় ঘর পার হইয়া একটা ঘরে থাকে এক সাঁওতাল যুবক। নাম—ভোলা। এই ভোলার সঙ্গেই ভুলির প্রথমে বিবাহের সম্বন্ধ হয়, পরে কি-একটা কারণে তাহা ভাঙ্গিয়া যায় এবং মাস-দুই পরে ভুলি স্বেচ্ছায় পীরুকে বিবাহ করে। আজও ভোলা তাহার কথার গোলাম! ভুলি মুখের একটি কথা খসাইলে ভোলা সবই করিতে পারে।

সেদিন আর ভুলির রাঁধিবার ইচ্ছা ছিল না, ঘরে বসিয়া থাকিতেও পারিল না। ধীরে-ধীরে ভোলার ঘরের দিকে চলিয়া গেল। ভোলার

ঘরে অন্য কেহই ছিল না। সে তখন মদ খাইয়া 'কবি' শুনিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

ভুলিকে দেখিয়া, লাঠিখানা ঘরের কোণে নামাইয়া রাখিয়া ভোলা বলিল,—ভুলি যে! আজ কি মনে ক'রে?

ভুলি বলিল,—কেনে, আস্‌তে নাই নাকি ভোলা?

ভোলা কহিল,—বোস্ তবে। তুই বাসন্তী-পুজো দেখতে যাবি নাই?

—না। আচ্ছা ভোলা, তুই বিয়া কর্‌বি নাই? লিজে রেঁধে খেছিস যে?

ভুলির এই একটি কথাতেই এক নিমেষের মধ্যে ভোলার প্রাণে গতদিনের অনেক কথাই মনে পড়িয়া গেল, বলিল,—না, আজ আবার সে-কথা কেনে ভুলি?

ভুলি বলিল, আমি 'শাঙা' করব তুথে, তুঁই যদি আমার একটি কাজ করিস্।

ভোলা তাহার কথায় বিশ্বাস করিল না, তবু আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, কি কাজ বল্ দেখি?

বাহিরে জ্যোৎস্নালোকিত উঠান্‌টার পানে ভুলি তাকাইয়া ছিল, হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—পীরুকে তুঁই গায়ের জোরে হারাতে পারিস্ ভোলা?

ভোলা নিজের স্ফীত মাংসপেশীগুলার পানে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—তা পারি হয় ত'।

—তবে এই কথা রইল তুর সঙ্গে, কাল যদি লড়াইএ জিততে পারিস্ তাহ'লে আমি তুরই।

ভোলা খুসী হইয়া ঈষৎ হাসিয়া বাঁশের লাঠিখানা হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল,—আমি তবে চল্‌লাম ভুলি।

ভুলিও তাহার পিছু-পিছু উঠিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ কি একটা কথা মনে পড়িতেই ভোলা পিছন ফিরিয়া বলিল, টুবুণী পীরুকে 'শাঙা' করবেক নাকি?

কথাটা গুরুতর না হইলেও, ভুলি লজ্জায় মরিয়া গেল। তাচ্ছিল্যের ভাব দেখাইয়া বলিল,—কে জানে তো!

ভুলি ঘরে ফিরিতেছিল, দেখিল, বৌয়ান-ঝোঁপের পাশ দিয়া যে-রাস্তাটা পাচ নম্বর খাদে গিয়া পৌছিয়াছে, সেই পথ ধরিয়া হাঁড়িদের কয়েকটা মেয়ে বড় বড় বাটিতে ভাত বাঁধিয়া খাদে চলিয়াছে আর সকলে মিলিয়া একসঙ্গে গান ধরিয়াছে—

—কেসো কুলে বন করেছে আলা লো,
কেসো কুলে বন করেছে আলা—!
ও ছুঁড়িরা! ঝড়িয়ে দে গা, সকল যাবে জ্বালা লো,
সকল যাবে জ্বালা!—

ভুলি তাহাদের পিছন ধরিল। ভাবিল মন্দ কি! ইহাদের সঙ্গে রাত্রে খাদে কাজ করিয়া কিছু রোজগার করিতে পারিবে।

খাদের কাছে যাইতেই খাদ-সরকার জিজ্ঞাসা করিল, কি করবি?—

—গাড়ী বোঝাই দিব।

সেদিন মধ্যাহ্নে সত্য-সত্যই ভোলা ও পীরুর শক্তি-পরীক্ষা হইয়া

গেল। পাঁচ নম্বর খাদের সুমুখে ট্রাম-লাইনের ধারে, পীরু খাদ হইতে ফিরিতেছিল, ভোলা পশ্চাৎ হইতে তাহাকে একটু ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া বলিল,—ইস্, বড় যে জোর হঁইছে তুর্ !

পীরুর মনটা ভাল ছিল না, বলিল, কই আমি ত' ঠেলি নাই।

ভোলা তাহার পিঠ চাপড়াইয়া ডান হাতখানা সজোরে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল,—আয়—পাঞ্জা লড়বি ?

পীরু সজোরে একটা ধাক্কা মারিতেই ভোলা মাটিতে পড়িয়া গেল। পীরু তাহার পিঠের উপর একটা লাথি বসাইয়া দিল।

ভোলা উন্মত্তের মত উঠিয়া পীরুর গলাটা ধরিয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া পিঠের উপর এমন এক ঘুঁসি মারিল যে, আঘাতটা সামলাইতে তাহার একটু সময় লাগিল।

পীরু সিংহবিক্রমে ভোলাকে আক্রমন করিল।

দূরে একটা অশ্বত্থগাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া ভুলি সমস্তই দেখিতেছিল। ভুলি জানিত, ভোলা হয় ত—হয়ত কেন, নিশ্চয়ই পরাস্ত হইবে, তথাপি তাহার এ আগ্রহ কেন হইল কে জানে ! পীরুর স্ফীত বক্ষ এবং সুগোল শরীর রাগে তখন আরও ফুলিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া ভুলির মনে আনন্দ হইতেছিল। আজ যদি তাহার স্বামীর সহিত ভুলির মনের সদ্ভাব থাকিত তাহা হইলে সে হয় ত' তাহার বিজেতা স্বামীর গলা জড়াইয়া সহস্র চুম্বনে তাহাকে তাহার অন্তরের অভিনন্দন জানাইত।

ভোলা টলিতে টলিতে ট্রাম-লাইনের পাশে গড়াইয়া গেল। পীরু তাহার ঘাড়টা ধরিয়া লাইনের উপর সজোরে ঠুকিয়া দিতেই কপালের খানিকটা কাটিয়া গিয়া রক্তের ধারা গড়াইয়া আসিল।

ভোলা পরাজিত !

পীরু আপন মনে রাস্তা ধরিল। পাছে দেখিতে পায় ভাবিয়া, ভুলি একটু পাশ ফিরিয়া আড়ালে দাঁড়াইল।

একটা সাঁওতালদের মেয়ে ছুটিয়া আসিয়া ভুলিকে জিজ্ঞাসা করিল,—এই ! টুরুণী কোথা জানিস্ ?

ভুলি জানিত না, বলিল,—কেনে ?

মেয়েটা বলিল,—আড়-কাঠি * তাকে খুঁজে বেড়াছে। সে নাকি আসামে কাজ করতে যাবেক্।

সংবাদটা শুনিবামাত্র ভুলির মাথাটা ঘুরিয়া গেল। কয়লা-কুঠি ছাড়িয়া টুরণী আসামের চা-বাগানে কাজ করিতে যাইবে ? সে তো জানে, সেখানে গেলে আর কেহ ফিরিয়া আসে না ! ভুলি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল,—আড়্কাঠি কোথা ?

—ওই যে ! বলিয়া মেয়েটা একটা লোকের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল।

এমন সময় পরাজিত ভোলা রক্তাক্ত দেহে ধীরে-ধীরে টলিতে টলিতে ভুলির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভুলি কোন কথা না বলিয়া একমনে কি ভাবিতেছিল। ভোলা বলিল,—আমি হেরে গেলাম ভুলি।

ভুলি তাড়াতাড়ি তাহার হাতটা ধরিয়া বলিল,—ভাবনা কি ভোলা ? —তুই এক কাজ কর। টুরণী এলে তাকে ধরে রাখিস, কোথাও যেতে দিস্ না। দেখিস্ ! আমি চট্ ক'রে শুঁড়িখানা থেকে আসি।

---

*আসামের চা-বাগানে যে ব্যক্তি কুলি-কামিন পাঠায় তাহাকে 'আড়-কাঠি' বলে।

ভোলা বলিল,—কোথা টুরণী ?

—বোধহয় সাত নম্বর খাদে গেইছে। যেখানেই যাক্‌ এই পঁথেই ফিরবেক।

ভুলির আদেশ! টুরণীর অপেক্ষায় ভোলা বসিয়া রহিল।

ভুলি মিথ্যা বলিয়াছে। শুঁড়িখানায় সে গেল না।

তাড়াতাড়ি আড়-কাঠির কাছে গিয়া বলিল,—কাথে খুঁজছিস হে ?

লোকটা তখন ষ্টেশনে যাইবার জন্য ব্যস্ত। বলিল,—টুরণী মেঝেন্‌কে। বল্‌তে পারিস কোথা আছে ?

ভুলি তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে সেখান হইতে আর-একটু সরাইয়া লইয়া গিয়া বলিল,—টুরণী আমারই বোন, সে যাবেক নাই, চল্‌ আমি যাব।

লোকটা বলিল,—বাঃ, তাকে যে পঁচিশটা টাকা দিয়েছি।

—আমাকেও ত দিথিস্‌?...আমি লিব নাই, চল্‌।

আড়-কাঠি সানন্দে বলিল,—চল্‌ তবে ইষ্টেশনে।

ভুলি তাহার সঙ্গে ষ্টেশনে আসিয়া দেখিল, আরও প্রায় কুড়ি-পঁচিশ জন কুলি-কামিন সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। বোধ হয় তাহারাও আসাম-যাত্রী।

ট্রেন আসিয়া দাঁড়াইল। ভুলির মনে হইতেছিল, কতক্ষণে সে ট্রেনে চড়িয়া চলিয়া যাইবে! সে আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। সকলের আগে ট্রেনে গিয়া বসিল।

ট্রেন ছাড়িয়া দিল। ভুলির চোখ দুইটা এতক্ষণে ছল্‌ ছল্‌ করিয়া আসিল। দূরে পলাশবনের ভিতর দিয়া টুরণী ছুটিতে ছুটিতে ষ্টেশনের

দিকে আসিতেছিল। বোনটাকে একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইয়া ভুলি জানালার পাশে সরিয়া বসিল।

ভুলির চোখে জল দেখিয়া একটা সাঁওতালের মেয়ে বলিল,—কাঁদছিস্ কেনে লো?

ভুলি চোখের জল মুছিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—দুৎ, কাঁদব কেনে?

ঝুম্‌রু

আষাঢ় আসিয়াছে,—বর্ষা নামিল বলিয়া! মাঝে মাঝে ঝম্‌ঝম্‌ করিয়া বৃষ্টি নামে, আবার তখনই বন্ধ হইয়া যায়। অবিশ্রান্তধারে বারিবর্ষণ এখনও সুরু হয় নাই—হইবার সূচনা হইয়াছে মাত্র।

রূপসা কয়লা-কুঠির সাঁওতাল-কুলিগুলা সব ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। এই দুরন্ত বর্ষার দিনে ছাতি ছাড়া তাহাদের চলে কেমন করিয়া? একে ত ঘরের ফুটা চাল গড়াইয়া জল পড়িবে, তাহার উপর মেয়ে-ছেলে সকলে মিলিয়া খোলা মাথায় চলা-ফেরা করিলে পরিণাম যাহা হইবে, তাহা ভাবিতেও কষ্ট হয়। কোম্পানী ছাতা কিনিয়া দিবে না,—নিজেদেরও তেমন সঙ্গতি নাই যে পয়সা খরচ করিয়া ছাতি কিনিবে। কাছে বন-জঙ্গল থাকিলেও-বা শিয়াড়ি পাতায় ছাতি তাহারা নিজেরাই তৈরী করিয়া লইতে পারে।

হঠাৎ একদিন একজন সাঁওতাল আসিয়া সংবাদ দিল, এখান হইতে ক্রোশ ছয়-সাতের মধ্যে ফরিদপুরের জঙ্গলে শিয়াড়ি পাতা পাওয়া যায়।

খবর পাইবা মাত্র, সকলে মিলিয়া কুঠির ম্যানেজার-বাবুকে ধরিয়া বসিল, —বাবু, একদিনের ছুটি আমাদিকে দিতে হবেক্—আমরা সব শিয়াড়ি পাতা আন্‌তে যাব।

বাবু বলিলেন, আগামী রবিবার খাদ বন্ধ, সেইদিন যাস্।

রবিবার প্রাতে সকলে বনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, এমন সময় পাঁচ-নম্বর সাঁওতালি-ধাওড়ায় একটা হাঙ্গামা বাধিল!

হাঙ্গামা তেমন বিশেষ কিছুই নয়।—

লছি সর্দ্দারের বাড়ীতে একটা ছোক্‌রা থাকিত, নাম,—ঝুম্‌রু। বয়স আঠারো কি উনিশ। দিব্য প্রিয়দর্শন চেহারা, মাথায় বাব্‌রি চুলের গোছা, সুদৃঢ় পেশীবহুল দেহ, উন্নত স্ফীত বক্ষ।

লছি সর্দ্দারের স্ত্রী দাসী তাহাকে পাঁচ বৎসর হইতে মানুষ করিয়াছে।

লছি সেদিন দাসীকে বলিল—চল্, পাত্‌কে যাবি। ভাতগুলা বেঁধে লে।

ঝুম্‌রু উঠানে দাঁড়াইয়াছিল। কথাটা শুনিতে পাইয়াই চীৎকার করিয়া বলিল—বাঁ, তুয়্ বেশ আক্কেল যা-হোক্! কাল সারারাত উ খাদে খেটে এলো, আর আজ বন্‌কে যাবেক্,—লয়?

লছি বলিল,—বেশ করবেক্, যাবেক্, তুয়্ কি?

ঝুম্‌রু তখন দাসীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, না মা, যাস না তুই! চল্ সর্দ্দার, আমি যেছি। একগাড়ী পাতা আমি নিজের মাথায় ক'রে এনে দিব।

'হারামজাদা' বলিয়া লছি উঠিয়া গিয়া হাতের লাঠিখানা সজোরে ঝুম্‌রুর পিঠে বসাইয়া দিয়া বলিল, তুই বেরো! তুখে মানুষ করেছি শুধু

পাতা আনবার জন্যে ? লয় ?...যা, বাবুদের বাসায় মাটি কাট্‌গা যা ! গতর্‌ খাটাঁই পয়সা আন্‌—নাহ'লে উপোস্‌ দে।

লাঠিটা ঝুম্‌রুর পিঠে বেশ জোরেই পড়িয়াছিল। কিন্তু একটা লাঠির আঘাত সহ্য করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল।

দাসী নিজের হাতে ঝুম্‌রুকে মানুষ করিয়াছে। কাণ্ড দেখিয়া দাসীর মাতৃহৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। স্নেহময়ী জননীর ব্যাকুলতা লইয়া দাসী তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া গেল। গেল বটে, কিন্তু তা'র পাষণ্ড স্বামীকে সে যথেষ্ট ভয় করিত। দূর হইতেই কহিল—ঝুম্‌রু তুঁই পালা। না হয় দে, উয়াকেও ঘা-কতক্‌ দে।......চল্‌ মাঝি চল্‌, আমি যেছি চল্‌। উয়াকে মারা কেনে তুর্‌ ?

লছি বলিল,—বেশ করেছি।...তবে লে, মর্‌ তুরা দু'জনায়—আমি চল্লম। বলিয়া, সে লাঠিখানা হাতে লইয়া নিজেই হন্‌ হন্‌ করিয়া চলিয়া গেল।

দাসী বলিল,—যাক্‌ খল্‌ভরা যাক্‌। আয় ঝুম্‌রু আয়, ঘরকে আয় !

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ঝুম্‌রুর এমন দিনও গিয়াছে, যখন সে পথের ধারে না খাইয়া মরিয়া গেলেও 'ঘরকে আয়' বলিয়া ডাকিবার লোক ছিল না।

ঝুমরু কহিল,—না, যাই ; পাতা আনি-গা। তুঁই ঘরে থাক্‌। বলিয়া ঝুমরু চলিয়া যাইতেছিল ; দাসী বলিল, কখন্‌ আস্‌বি তার ঠিক নাই,—চারটি খেঁয়ে যা।

ঝুম্‌রু ফিরিল না। বলিল,—খাব নাই, যা।

দাসী বলিল,—মরগা তবে।

ঘরে ঢুকিয়া দাসী দেখিল, রাঁধা ভাতগুলা সব পড়িয়া রহিয়াছে। একদৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ সেইদিকে তাকাইয়া থাকিয়া আর-একবার সে বাহিরে আসিল। ইচ্ছা হইতেছিল, ঝুমরুকে ফিরাইয়া তাহার হাতে ভাতগুলা বাঁধিয়া দেয়, কিন্তু সে তখন বহুদূরে চলিয়া গেছে। দূরে বোয়ান গাছের ঝোঁপের পাশে বন-যাত্রী সাঁওতাল পুরুষ ও রমণীগণ সারি বাঁধিয়া চলিতেছিল। ক্ষান্ত-বর্ষণ বাদল-প্রভাতে তাহারা সমস্বরে বর্ষার গান ধরিয়াছে—

মাদল বাজা লো, বাদল নামে,
ভ্যাখ্ বাদল নামে!
তুর চোখের জলে
কেনে কাজল ঘামে।

দাসীর ভাল লাগিল না। একথালা ভাত বাড়িয়া নিজেই খাইতে বসিল, কিন্তু তাহার উচ্ছ্বসিত অশ্রু সে রোধ করিতে পারিল না।

কিন্তু মা বলিয়া ঝুমরু যে কাহাকে সম্বোধন করিল, দাসী তাহা বুঝিল না। জীবনে কোন দিন সে 'মা' বলিয়া কাহাকেও ডাকিতে পায় নাই। তাহার উপর এম্‌নি অদৃষ্ট যে, সে নিজেও কাহারও মা হইতে পায় নাই! মাতৃ-পিতৃহীন অনাথ বালক ঝুমরুকে কেন যে সে আকুল আগ্রহে বুকে টানিয়া লইয়াছে তাহা একমাত্র সে-ই জানে। অনাথিনী দাসীও তাহারই মত একদিন কাঙালিনীর বেশে একটুখানি স্নেহের জন্য পথে-পথে ভিক্ষা মাগিয়াছে। কিন্তু,—সে যে তাহাও পায় নাই। ভাবিয়াছিল, স্বামী-

সোহাগিনী হইয়া হয়ত তাহার জীবনের দুঃখ সে ভুলিবে। কিন্তু সে নষ্ট-চরিত্র মদ্যপায়ী পাষণ্ড যে তাহাকে এমন করিয়া প্রতারণা করিবে তাহা সে কোনো দিন ভুলিয়াও ভাবে নাই!

লছি ছাড়া অন্যান্য সকলে দিনের খাবার বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছিল। প্রায় সমস্তটা দিন বনে-বনে শিয়াড়ি পাতা ছিঁড়িয়া, গান গাহিয়া নাচিয়া হাসিয়া পড়ন্ত-বেলায় সকলে রূপ্‌সা ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছিল। লছি বহুপূর্ব্বে নিজের পাতা লইয়া চলিয়া গেছে।

কিন্তু ঝুমরু ও মতিকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সকলে ভাবিল, তাহারা নিশ্চয়ই রূপসা ফিরিয়াছে, নইলে এখনও তাহাদের দেখা পাওয়া গেল না কেন?

মতির বাবা লোটন্ মাঝি, কোনো প্রকারেই বিশ্বাস করিতে পারিল না যে, তাহার যুবতী কন্যা মতি তাহাকে না জানাইয়াই ফিরিয়া যাইবে। লোটন বলিল, তোরা যা। আমি মতিকে না নিয়ে যাব নাই। সে কিছুতেই রূপসা ফিরে নাই,—বনেই আছে।

এই বলিয়া লোটন তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইল।

অন্যান্য সকলে চলিয়া গেল।

ঝুমরু ও মতির একটা ইতিহাস আছে।

এক-একসময় ঝুম্‌রুর মনে হইত,—যদি কোনো কিশোরী তাহাকে ভালবাসে, তাহা হইলে সে ধন্য হইয়া যায়।

এম্‌নি সময় একদিন এই রূপসা কয়লাখনির অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে মতির সহিত তাহার দেখা! মতি ঝুড়ি মাথায় দিয়া টবগাড়ীতে কয়লা বোঝাই করিতেছিল। ঝুমরু তাহারই পাশে কয়লা কাটিতেছিল।

কয়লা-স্তূপের উপরে ঝুলানো কয়েকটা কেরোসিনের আলোর ম্লান আলোকে ঝুমরু মতির মুখখানি দেখিল, তাহার কণ্ঠস্বর শুনিল, লীলায়িত চপল গতি-ভঙ্গী দেখিয়া মুগ্ধ হইল। সেদিন কয়লা কাটিতে তাহার ভাল লাগিল না। শুষ্ক নীরস কয়লার উপর গাঁইতির চোট্‌গুলা যেন ঠং ঠং করিয়া মানব-হৃদয়ের আর্ত্তনাদের মতই শুনাইতেছিল।

খাদ হইতে উঠিয়া সন্ধান লইয়া জানিল, মতির মা-বাপ মাত্র তিন-চারদিন হইল পারথাবাদ খনি হইতে এখানে আসিয়া কাজ করিতেছে। পরিচয় হইতে বিলম্ব হইল না।

পরে প্রতিদিন মনের আনন্দে ঝুমরু খাদের নীচে কয়লা কাটিত, মতি তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঝুড়ি দিয়া কয়লা বহিত। রবিবারদিন একসঙ্গে হাটে যাইত। কত রকমে কত অপ্রয়োজনীয় কথার সৃষ্টি করিয়া তাহাদের নীরবতা ভঙ্গ করিত। উভয়ে উভয়ের মুখের পানে তাকাইয়া বাহিরের জগৎটাকে ভুলিয়া যাইত।

সেদিন ফরিদপুরের জঙ্গলে পাতা আনিতে গিয়া ঝুমরু দেখিল, মেয়েদের সঙ্গে সারি বাঁধিয়া মতিও চলিয়াছে।

বনের ভিতর গিয়া ঝুমরু বলিল—মতি, চল্‌ আমরা এই দিকে পাতা নিয়ে আসি।

সে-দিকে কেহই যায় নাই!

ঝুমরু ও মতি পাশাপাশি বনের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিল। কাহারও মুখে কোন কথা নাই! বায়ু-হিল্লোলে গাছের পাতা থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, সংকীর্ণ বন-পথে মাত্র দুই জোড়া পদশব্দ ছাড়া আর-কিছু শোনা যায় না! যে সঙ্কীর্ণ পথটুকু ধরিয়া তাহারা উভয়ে পাশাপাশি

চলিয়াছিল, কয়দ্দুর গিয়া সে-পথ যে কোন্ দিকে গিয়াছে তাহার সন্ধান মিলিল না। পথ হারাইয়া উভয়ে থমকিয়া দাঁড়াইল।

ঝুঁকিয়া-পড়া তমালের একটা ডাল তুলিয়া ধরিয়া ঝুমরু বলিল—আয় মতি, এই দিকে পথ আছে, আয়!

পাতার ভিড় ঠেলিয়া মতি পার হইতে পারিতেছিল না। ঝুমরু এক হাতে তাহার একটা হাত ধরিয়া পার করিয়া দিল। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উভয়েই শিহরিয়া উঠিল। ওপারে গিয়া বন যেন আরও নিবিড় হইয়াছে। মতি বলিল—আর কত দূর ঝুমরু?

ঝুমরুর ইচ্ছা করিতেছিল, সে বলে,—কে জানে কতদূর! এমনি করিয়া উভয়ে উভয়ের একান্ত পাশাপাশি এমনি স্নিগ্ধ সুরভিত বনপথ ধরিয়া তাহারা সমস্ত জীবন ধরিয়াই ত চলিতে পারে! এই গভীর অরণ্যানী ভেদ করিয়া পৃথিবীর কোন মানবের বিষদৃষ্টি আসিয়া পৌঁছিবে না,—হিংসাহীন, দ্বেষহীন, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের ভিতর দিয়া যদি সে এই রহস্যময়ী নারীর হাত ধরিয়া পথ চলিতে চলিতে জীবনের সমস্ত শূন্যতা ভরিয়া লইতে পায় তাহা হইলে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়া সে চলিবে,—শুধু চলিবে! বাধা-বন্ধহীন এ পথ-চলার যেন শেষ না হয়!

ঝুমরু মুখে কিছুই বলিতে পারিল না। মতির আয়ত দৃষ্টির পানে একবার চাহিল মাত্র। মতি ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—না ঝুমরু, আর যাব নাই। ভাতগুলো বাঁধা রইছে, লে,—খাই দুজনায়।

গাছের ছায়ায় ঘাসের উপরে তাহারা দুইজনে বসিল। বাটিতে বাঁধা ভাতগুলা উভয়ে ভাগাভাগি করিয়া খাইল। পুনরায় জলের সন্ধানে তাহাদের উঠিতে হইল।

বনের মধ্য দিয়া যে ছোট নদীটি প্রবাহিত হইয়া যাইতেছিল, তাহার স্নিগ্ধ জলে তাহারা হাত-পা ধুইল, অঞ্জলি ভরিয়া জলপান করিল। মতি বাটিটি ধুইয়া মুছিয়া আবার বাঁধিয়া লইল।

ঝুম্‌রুর সঙ্গে শালপাতার কয়েকটা চুটি ছিল। বলিল, চুরুট খাবি মতি?

—না। আগুন কোথা পাবি?

—আয়, আগুন করি ত্থাখ্। বলিয়া একটা অশ্বত্থগাছের সন্ধানে তাহারা আবার চলিতে লাগিল।

পথ চলিতে চলিতে একটা শুক্‌নো গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া ঝুমরু বলিল, ই-গাছেও আগুন হয়। বলিয়া দুইখণ্ড কাঠে ঘষাঘষি করিতেই আগুন বাহির হইল। ঝুমরু চুরুট ধরাইয়া সেইখানেই বসিল।

মতি বলিল, শিয়াড়ি পাতা লিলি নাই যে?

কথাটা ঝুমরুর স্মরণ ছিল না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, হঁ ত! চল্।

তাহারা উঠিতে যাইবে, এমন সময় পরুষ-কণ্ঠে লোটন ডাকিল—মতি!

উভয়েই চমকিয়া উঠিল! সম্মুখে মতির বাবা—লোটন্ মাঝি!

মতির হাত ধরিয়া লোটন তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল। বলিল—চল্ ঘরকে!

ঝুমরুকে কোনও কথা বলিল না।

ঝুম্‌রুর হাত হইতে চুরুটটা আপনা হইতেই পড়িয়া গেল। সে এক দৃষ্টে সেই দিকে তাকাইয়া রহিল। গাছের পাতার অন্তরালে যখন

তাহাদের আর দেখা গেল না, ঝুমরু তখন ধীরে-ধীরে চলিতে লাগিল।

শিয়াড়ি পাতার বোঝাটা নামাইয়া লছি বলিল,—দে—দে, ঝপ্ ক'রে ভাত দে। ক্ষিদে লেগেছে।

—হুঁ, দি। বলিয়া দাসী ভাত বাড়িতে বসিল। বলিল—ঝুমরু কই?

—কি ক'রে জানবো? আমি উসব জানি না। বলিয়া লছি মুখ ফিরাইয়া বসিল।

দাসীর আর কথা কহিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। তবু বলিল—উ বন্‌কে যায় নাই? কিছুই খায় নাই যে!

—মরুক্ কেনে। না খাগ্‌গে, তুর কি?

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। তখনও ঝুমরু ফিরিল না দেখিয়া দাসী উদ্বিগ্ন হইয়া বসিয়া রহিল। কাহাকেও কোন কথা বলিল না।

এমন সময় লোটন মাঝি ছুটিয়া আসিয়া দাসীকে কহিল, এই! সর্দ্দার কই?—লছি সর্দ্দার?

সর্দ্দার অন্ধকার উঠানের এক পাশে বসিয়া মদ খাইতেছিল; বলিল, কেনে রে? কি বল্‌ছিস্ লোটন্?

লোটন তাহার কাছে আগাইয়া আসিয়া বলিল, এই শুন্ সর্দ্দার,—তুর ঘরে ঝুম্‌রু ব'লে যে-ছোঁড়া থাকে, তাকে আমি খুন্ করব। তুই কিছু বল্‌তে পাবি নাই।

ঈষৎ হাসিয়া লছি বলিল,—কর্‌গা কেনে। এখুনি করগা।

—মিছা লয় সর্দ্দার, শুন্ তবে। মতির সঙ্গে উয়ার এমন কিসের ভাব যে বনে-বনে—

পান-পাত্রটা হাত হইতে মাটিতে নামাইয়া লছি বলিল—কি বল্‌লি? মতি, তুর বিটি মতি?

হঁ।

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া লোটন বলিল,—না-হয় বিয়া দে উয়াদের দুজনাকে।

লছি তাহার স্ত্রী দাসীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—শুন্ দাসী, শুন্। তুঃ ঝুম্‌রুর গুণ শুন্। হঁঃ, বিয়া দিব নাই আবার! কিস্‌কে! আমার পুইসা অত সস্তা লয়।

দাসী নিরুত্তর।

লোটন বলিল—হঁ, তাই ত্যাখ্ সর্দ্দার। বিয়াই দে। আমরা সব ঠিক করেছি, উয়াকে মেরে দিব তা না হ'লে।

দাসীর মাতৃহৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। ভাবিল ইহার একটু প্রতিবাদ করে; কিন্তু মাতাল স্বামী হয়ত তাহা হইলে কিছু বাকী রাখিবে না। দাসীর হাতে গোটা পঁচিশ-ত্রিশেক্ টাকা ছিল। তাহা দিয়া ঝুম্‌রুর ত বিবাহ হইতে পারে! দাসী ঘরে গিয়া হাঁড়ির ভিতর হইতে তাহার সঞ্চিত টাকা-কয়টি লইয়া আসিল। মনে করিল, লোটন এ সম্বন্ধে আর বেশি-কিছু বলিলে টাকাগুলি তাহার হাতে দিয়া ঝুম্‌রুর সহিত মতির বিবাহ দিতে অনুরোধ করিবে।

ঠিক এই সময়টায় তাহাদের ধাওড়াঘরের সম্মুখে চিন্তি ডোমের

উঠানে যে কয়লার উনানটা জ্বলিতেছিল, তাহারই পাশে ঝুম্‌রু আসিয়া দাঁড়াইল। লছি ও লোটন তখন মদিরা পানে এবং কথা-প্রসঙ্গে এমনি মহগুল হইয়া পড়িয়াছে যে, সে দিকে তাহাদের নজর দিবার অবসর নাই। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার আলোকে ঝুম্‌রুকে বেশ স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া গেল। দাসী তাড়াতাড়ি সেখান হইতে উঠিয়া ঝুম্‌রুর দিকে অগ্রসর হইল।

ঝুম্‌রুর হাতে ধরিয়া তাহাকে পাশের অন্ধকারে টানিয়া আনিয়া দাসী তাহার হাতে টাকাগুলা গুঁজিয়া দিল। বলিল—লোটন মাঝা এসেছে। বেশি-কিছু বলে ত বলবি,—'হেই লে টাকা, আমি মতিকে বিয়ে করব।' শুন্‌ছিস্‌?

দাসীকে হঠাৎ চলিয়া যাইতে দেখিয়া, লছি-সর্দ্দার সেই দিক পানে একবার তাকাইল। অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে দেখিল, সে যেন কাহার সহিত কথা কহিতেছে। লোটনকে বলিল,—ব'স্‌। দেখি হয় ত' সে-ছোঁড়া এসেছে! বলিয়া লোটনের লাঠিখানা হাতে লইয়া অন্ধকারের মধ্যে চুপি-চুপি লছি সেই দিকে অগ্রসর হইল।

দাসীর কথাগুলা সে শুনিতে না পাইলেও ঝুম্‌রুর উত্তরটা শুনিতে পাইল। সে বলিতেছে,—না তুর টাকা আমি লিব নাই। তুর ঘরেও আমি থাকৃব নাই। আমার তরে সবারই কষ্ট কেনে!

হঠাৎ ঝুম্‌রুর মাথার লম্বা চুলে টান পড়িতেই ফিরিয়া দেখিল, লছি! বিরক্ত হইয়া ঝুম্‌রু বলিল,—ছেড়ে দে!

—এই যে দিই। বলিয়া, হাতের লাঠি দিয়া লছি তাহাকে মারিতে আরম্ভ করিল।

ঝুম্‌রুর অসহ্য হইয়া উঠিল। সজোরে এক ঝাঁকানি দিয়া লছিকে দূরে সরাইয়া দিল।

আকাশে মেঘের গর্জ্জন! বোধহয় বৃষ্টি নামিবে!

হাতের টাকাগুলা ঝনাৎ করিয়া দাসীর পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া ঝুমরু অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

দাসী চীৎকার করিয়া ডাকিল—ঝুমরু!

লছি বলিল—খবরদার দাসী, আর উয়াকে ডাকিস না।

তবে আমিও যাব, ছাড়্! বলিয়া দাসী তাহার স্বামীর মুখের পানে তাকাইল।

সর্দ্দার টাকাগুলা কুড়াইয়া লইয়া দাসীকে সজোরে টানিতে টানিতে ধাওড়ার দিকে লইয়া আসিল, বলিল,—তা বৈ-কি! তুর যেমন কত লিজের পেটের ছেলে!

ঝম্ ঝম্ করিয়া বাদল নামিল। তাড়াতাড়ি সকলে ঘরে ঢুকিল। সর্দ্দার বলিল, আয় লোটন, ঘরকে আয়।

অদূরে লোটনের ধাওড়া-ঘর হইতে একটা গানের সুর বাদলের বাতাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া তাহাদের কানে আসিয়া বাজিল। মতি গাহিতেছিল,—

কি করব, কোথা যাব, মরণ কেনে হলো নাই
কপালে কলঙ্ক ছিল, জলে ধোওয়া গেল নাই।

দাসী তখন চৌকাঠের উপর বসিয়া, সম্মুখে বিরাট অন্ধকারের দিকে

তাকাইয়া ! বাহিরে অজস্র-ধারে বারিপাতের শব্দ। আকাশে মেঘের গর্জ্জন ! একটা অত্যুজ্জ্বল বিদ্যুৎ-শিখা আকাশের বুক চিরিয়া একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটিয়া গেল।

দাসীর চোখ দুইটি তখন অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।—তোর দোষ নাই রুমক ! আমার পোড়া কপালের দোষ।

জননী

বসন্তের প্রারম্ভেই তিন চার দিন ধরিয়া ক্রমাগত ঝড়-বাদল সুরু হইয়াছিল। তাহাতে আর কাহারও বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই বটে, কিন্তু দুখন সর্দ্দারের কুলি-ধাওড়ার সুমুখে যে ক্ষুদ্র বাগানটা ছিল, তাহার প্রায় সমস্ত আম গাছের মুকুলগুলি খসিয়া পড়িল এবং খড়ো ঘরের চালাটাও প্রায় উড়িয়া গিয়া ঘরের ভিতর জল-প্রবেশের পথটা পরিষ্কার করিয়া দিল।

সেদিন মেঘলা-শীত-শীত সকালে দুখন ঘরের চালায় লেপ মুড়ি দিয়া বসিয়াছিল, ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে ঝরা-মুকুলের বেশ একটা স্নিগ্ধ-মধুর মিঠা গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। দেখিল, গত রাত্রে ঝড়বৃষ্টির দাপাদাপিতে ঝরা মুকুল ও কচি পাতায় সমস্ত বাগানটা ভরিয়া গিয়াছে।

প্রত্যূষে উঠিয়াই পিপাসায় তাহার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল। দুখন সূর্য্য না দেখিয়া জল-গ্রহণ করিত না। গত দুই দিন সূর্য্যদেব কৃপা করিয়া তাহাকে দর্শন দেন নাই,—তাহারও জল-গ্রহণ করা হয় নাই; কিন্তু কি

করিবে বুড়া বয়সে ধর্ম্মরক্ষা করিতে গিয়া যদি কিছু কষ্ট হয় তাহা সহ্য করিতে হইবে বৈ-কি! নিজের গত জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিতে গেলে, সেখানে ত পুণ্যের অংশ এতটুকুও দেখিতে পায় না! যৌবনে যখন তাহার শিরায় শিরায় গরম রক্ত প্রবাহিত হইত, তখন সে ঠাকুর-দেবতাকে বিশ্বাসও করিত না এবং তাহার মনে হয়, বোঙার (দেবতার) কাছে মাথা না নোয়াইবার শাস্তি সে হাতে-হাতে পাইয়াছে। এমন একদিন ছিল, যেদিন এই কুলি-ধাওড়ার কুঁড়ে ঘরটাই তাহার ছেলে মেয়ে আত্মীয়-স্বজনে ভরিয়া থাকিত। আজ বাঁচিয়া থাকিবার মধ্যে আছে শুধু সে নিজে, আর পনর-ষোল বছরের এক ভ্রাতুষ্পুত্রী—পরী। যাক্ সে-সব অনেক কথা।

পরী তালপাতার বড় ছাতিটায় আপাদ-মস্তক ঢাকিয়া তপ্সীর হাটে চাল-ডাল কিনিতে যাইতেছিল, দুখনকে চুপ করিয়া ভাবিতে দেখিয়া বলিল,—আজও কি খাবি নাই না কি হে জ্যেঠা?

দুখন পরীর মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, সুয্যি যে উঠল নাই, পরী-মা?

—ই-বছর যদি না উঠে সুয্যি, তুই খাবি নাই, তাই ব'লে?

—হাটে যেছিস্?—যা। দেখি যদি সুয্যি উঠে।

তুঁই তবে থাক্ জ্যেঠা, আমি চল্লম—বলিয়া পরী চলিয়া যাইতেছিল, দুখন বলিল, বলদটাকে চারটি খেড় দিয়ে যা পরী, আর অম্‌নি দেখে যা মুরগীগুলা বেরোল কি না।

বলদের মুখের নিকটে আঁটি-দুই খড় আগাইয়া দিয়া এবং মুরগীগুলা বাহির করিয়া, পরী বাগানের পাতা ও মুকুল-ঝরা পথ ধরিয়া চলিতে

চলিতে একটা আমের মঞ্জরী মাথায় গুঁজিয়া লইল। মেঘে-মেঘে অন্ধকার প্রান্তর! চারিদিক কুয়াশায় আবৃত। পরী গান ধরিল—

সে এলে মার্‌বো কুঁকুড়ি গো,—
মারবো কুঁকুড়ি *—!
তাকে আমি খেতে দিব, পায়রা ঘুঘুড়ি গো—
পায়রা ঘুঘুড়ি †—!
পিয়ারী—আস্‌বি কবে?
ও পিয়ারী, আস্‌বি কবে—!

গাছ ও পাতার ভিতর দিয়া পূর্ব্বাকাশের যে ঈষৎ ফাঁকটুকু দেখা যাইতেছিল, বৃদ্ধ তখন একাগ্রদৃষ্টিতে সেই দিকে তাকাইয়া দেখিতেছিল, যদি একটি বারের জন্যও সূর্য্যদেব করুণা করিয়া দেখা দেন। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। কয়েকবার ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টিও হইল, কিন্তু সূর্য্যের দেখা পাওয়া দূরে থাক্‌, আকাশের গায়ে মেঘে মেঘে জটলা আরও গাঢ় হইয়া আসিতে লাগিল।

আজ এই বাদলের প্রভাতে তাহার অনেক কথাই মনে হইতেছিল। সুখে দুঃখে জীবনের অনেক ক'টা দিন সে কোন রকমে পার করিয়াছে, বাকী আছে মাত্র আর কয়েকটা দিন। অসুরের মত বলবান্ তাহার এক ভ্রাতা এবং দুইটি পুত্র ছিল। তাহারা চার জনে মিলিয়া কয়লা-কুঠিতে কাজ করিত। আহারের সংস্থান করিতে গিয়া পয়সার পরিবর্ত্তে তাহারা গায়ের রক্ত দিয়াছে। দুবেলা পেট পুরিয়া খাইয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া

---

* মোরগ   † ঘুঘু

গায়ের যে রক্তটুকু জমা করিত, মনিবের পায়ে সেটুকু ঢালিয়া দিয়াও যখন কোন প্রকারেই তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিল না, তখন তাহারা প্রাণ দিতেও কসুর করিল না। সেই কয়লাখনির পাতাল-গহ্বরের ভীষণতম স্থানে কয়লা কাটিতে গিয়া একে একে তাহারা সমাধিস্থ হইয়া রহিল,—বেদনা-দুর্ভোগ সহিবার জন্য বাঁচিয়া রহিল সে নিজে! কিছু দিন পরে পুত্র-শোকাতুরা তার স্ত্রী চলিয়া গেল। এক কন্যা ছিল,—সেও গেল। কন্যার শোচনীয় মৃত্যুর ঘটনাটাই তাহার বেশি করিয়া মনে হয়। সিদ্ধেশ্বরী কুলি-ধাওড়ায় এক সাঁওতাল-যুবকের অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য এবং সবল শরীর দেখিয়া দুখন তাহাকেই কন্যাদান করিয়াছিল। বিবাহের পর হইতেই মেয়েটা নিজের স্বামীর দুশ্চরিত্রের কথা দুখনকে মাঝে মাঝে জানাইত কিন্তু দুখন সে-সব কথা কোনদিনই বিশ্বাস করিত না। ভাবিত, হয়তো ঝগড়া-ঝাঁটি হইয়াছে মেয়েটা তাই মিথ্যা বলিতেছে। কিন্তু তাহার ভুল সন্দেহ সত্য বিশ্বাসে পরিণত হইল সেইদিন, যেদিন সে অভাগীর মৃত্যু-শয্যায় তাহার ডাক পড়িল। সিদ্ধেশ্বরী-ধাওড়ায় গিয়া দেখিল,—কন্যা মরণের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করিতেছে। পিতাকে দেখিয়াই ক্ষণেকের জন্য চুপ করিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইতেই কন্যার দুচোখ ছাপাইয়া জল আসিল, অতি কষ্টে বলিল,—বিষ খেয়েছি বাবা, আমাকে আর বাঁচাস্ না—আমি চল্লম্।

আঃ, অভাগী মা আমার! বৃদ্ধ দুখন্ আর ভাবিতে পারিল না। —এমন সময় দেখিল, মোটা কাপড়ের এক প্রান্তে ডাল তরকারী ইত্যাদি বাঁধিয়া হাটের ফেরত পরী, বাগানের পথ ধরিয়া ছুটিতে ছুটিতে সেই দিকেই আসিতেছে। পথে বৃষ্টির জলে ভিজিয়া তাহার তালপাতার

ছাতি বহিয়া জল গড়াইতেছিল,—পরণের কাপড়খানাও স্থানে স্থানে ভিজিয়া গিয়াছে।

ঘরের চালার উপর ছাতিটা এক কোণে নামাইয়া রাখিয়া, আঁচল হইতে তরকারীগুলা ফেলিয়া দিয়া বলিল,—দু'জনার মতন রাঁধি তাহ'লে —কি বল্, জেঠা?...এঁ্যা, ই কি! তুই কাঁদ্‌ছিস্ কেনে?

দুখন্ তখনও চোখের জলটা সাম্‌লাইয়া লইতে পারে নাই, তাই তাড়াতাড়ি হাত দিয়া জলটুকু মুছিয়া লইয়া কহিল,—না, কাঁদি নাই পরী।...তুই ওগুলা রেখে আয়—এইখানে বোস্! একটা কথা বলব।

পরী দুখনের কাছে গিয়া বসিয়া বলিল, বল্ কি কথা, এখনই বল্, শুনি।

—ওইগুলা রেখে আয় এগুতে।

—না, রাখব নাই, তুই বল্-কেনে কি কথা?

দুখন্ পরীর মুখের পানে একবার তাকাইল। বলিল, আরও এই দিকে স'রে আয়, বলি।

পরী আরও কাছে সরিয়া একেবারে বৃদ্ধের কোল ঘেঁসিয়া বসিল। দুখন তাহার দুর্ব্বল শীর্ণ হাতখানা একবার তাহার মাথার উপর ধীরে ধীরে রাখিয়া পুনরায় সরাইয়া লইল। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—তুই কখনও বিয়া করতে পাবি নাই পরী।

বৃদ্ধ আরও কিছু বলিবে ভাবিয়া পরী চুপ করিয়া বসিয়াছিল, দুখন বলিল,—মিছে কথা লয়—বল্ মা, বল্। ই বুড়ার কথা রাখবি কি না বল্।...দুখন পরীর হাত দুইটা বেশ করিয়া চাপিয়া ধরিল।

অ, এই কথা!—হঁ রাখ্‌ব, ছাড়্। বলিয়া পরী তাহার হাতটা

ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, ভাত রাঁধি তাহ'লে, খাবি তো?

বৃদ্ধ ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল,—না।

২

গত তিন দিন জলটুকু পর্য্যন্ত না খাইয়া বৃদ্ধ দুখনের আজ আর উঠিবার শক্তি ছিল না। অতি কষ্টে দু'-একটা কথা কহিতেছিল মাত্র।

হু হু শব্দে ঝড় বহিতেছিল। আমের বাগানে যে-কয়টা মুকুল অবশিষ্ট ছিল, তাহাও ঝরিয়া পড়িল। এ বৎসর অপর্য্যাপ্ত মুকুল দেখিয়া দুখন ভাবিয়াছিল, আম বেচিয়া কিছু টাকা করিতে পারিবে, কিন্তু সে আশাটুকুও যখন রহিল না, তখন অনন্যোপায় হইয়া পরীকে বলিল, পরী মা, আম এ-বছর কিছুই হবেক্ নাই,—তা না হোক, ধান যা রইল তাতে কিছুদিন চল্‌বেক্। টাকাও কিছু আছে, লয়?

পরী ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—হুঁ।

বুড়া বয়স পর্য্যন্ত প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া, নিজে এক বেলা খাইয়া দুখন যে টাকাগুলি ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহা যে আজ পরীর জন্য রাখিয়া যাইতে পারিতেছে, ইহাতেই তাহার অপরিসীম আনন্দ!

অন্তিমকাল যে ঘনাইয়া আসিয়াছে এবং সে যে আর বেশীক্ষণ বাঁচিবে না, এ কথা দুখন প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অনুভব করিতেছিল, কিন্তু সে অপ্রিয় সত্যটা পরীর কাছে কোন প্রকারেই প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না। দু' একবার বলিবার চেষ্টা করিল কিন্তু ঠোঁট দুইটা

কাঁপিয়া কাঁপিয়া থামিয়া গেল। বুকের ভিতর অস্বস্তিকর একটা জ্বালা লইয়া বৃদ্ধ মৃত্যু-শয্যায় ছটফট করিতে লাগিল।

পিপাসায় বৃদ্ধের কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, কথাগুলা তাহার মুখ হইতে অতি কষ্টে উচ্চারিত হইতেছিল দেখিয়া পরী তাহার মুখের কাছে এক ঘটি জল ধরিয়া কহিল, খা জ্যেঠা, একটুকু জল খা। তুই অমন্ করিস্ না।

ভ্রাতুষ্পুত্রীর এ স্নেহের অত্যাচার অন্যায় না হইলেও ভুখন হাত দিয়া জলের পাত্রটা সরাইয়া দিয়া কহিল,—না।

ভর্ৎসনার কোন কথাই মুখ দিয়া বাহির হইল না। মনে হইতেছিল বৃদ্ধের চোখ ফাটিয়া আগুন ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে!

ভুখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কি যেন ভাবিতেছিল, হঠাৎ ঝড়ের একটা দম্‌কা ঝাপটে তাহাদের ক্ষুদ্র কুটীরের কবাট দুইটা খুলিয়া গেল। পরী উঠিয়া দরজা বন্ধ করিতে যাইতেছিল, ভুখন্ বলিল,—কে,—লামা?

তাহারই সমবয়স্ক লামা মাঝি ভুখনের অন্তরঙ্গ বন্ধু। সে থাকিত তিন নম্বর কুলি ধাওড়ায়। পরী বলিল, লামাকে ডাক্‌ব জ্যেঠা?

সে যেন তাহারই মত কোন বন্ধুর প্রতীক্ষা করিতেছিল। অতিশয় আগ্রহের সহিত মাথা নাড়িয়া ভুখন কহিল—হুঁ।

পরী তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া লামার ধাওড়ার দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিল। সে দেখিল, বাহিরে প্রবল ঝড়ের সঙ্গে গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে এবং জমাট মেঘের গাঢ় অন্ধকারটাও ধীরে-ধীরে কাটিয়া আসিতেছে। পরীর আনন্দ হইতেছিল,—বুঝি-বা এইবার সূর্য্য উঠিবে।

তিন নম্বর কুলি-ধাওড়ার যে-ঘরটায় লামা মাঝি থাকিত, সেই ঘরের দরজায় গিয়া দাঁড়াইতেই, লামার পুত্র টুরা জিজ্ঞাসা করিল,—অই, পরী যে! ছুটতে ছুটতে কোথা থেকে এলি?

পরী ঘরের চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া একটু সামলাইয়া লইল; বলিল, —তুর বাপ কোথা টুরা?

—ঘরে নাই, কেনে?

—কোথা গেইছে?

—সিদ্ধেশ্বরী-ধাওড়ায় তুলনী মেঝেনীর ঘরকে।

পরী আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। সিদ্ধেশ্বরী-ধাওড়া সেখান হইতে অনেকখানি পথ, কাজেই অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে সেই দিকেই চলিতে লাগিল।

টুরা বলিল, ওই, দাঁড়ালি নাই যে? তার সাথে তুর কি কাজ বল্ কেনে?

পরী তখন অনেকখানা পথ চলিয়া গিয়াছে। টুরার কথাটা শুনিতে পাইয়াও কোন উত্তর দিল না।

সিদ্ধেশ্বরী-ধাওড়া হইতে লামাকে সঙ্গে লইয়া পরী যখন তাহাদের কুটীরে ফিরিতেছিল, তখন আকাশের এক কোণে সূর্য্যের ঈষৎ আভাষ দেখা দিয়াছে। পরী তাড়াতাড়ি হাঁটিতে আরম্ভ করিয়া লামাকে বলিল, তুই চলতে লারছিস না-কি বুড়া?—হ-দেখ, সূয্যি উঠেছে, আমি চল্লম, তুই পেছুকে আয়।

দুখনকে কিছু খাওয়াইবার জন্যই পরী লামার আগেই ছুটিয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া, বৃদ্ধের শয্যাপার্শে আসিয়া ডাকিল,—জ্যেঠা,—ও জ্যেঠা!……

কোন সাড়া-শব্দ পাইল না। অথচ দুখনের স্পন্দন-রহিত চক্ষের অনিমিখ চাহনি সকরুণ ভাবে তাহারই মুখের উপর জ্বল্-জ্বল্ করিতেছে!……

পরী সভয়ে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িয়া দুখনের গায়ে হাত দিয়া আবার ডাকিল।

জীবন-হীন মৃত দেহটা তেমনি নিসাড়!

পরী জোর করিয়া তাহাকে একবার নাড়া দিতেই শক্ত হিম-শীতল দেহটাও নড়িয়া উঠিল। এতক্ষণে পরী বুঝিতে পারিল, তাহারা ফিরিয়া আসার সময়টুকু পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবার অবসর সে পায় নাই, তাহার পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছে!

বেদনার গুরুভার পরীর কণ্ঠ ছাপাইয়া উঠিতেছিল। সে ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রাঙ্গনের এক পার্শ্বে একটা শুষ্ক আম্‌ড়া গাছের ডালে দুইটা কাক খাঁ খাঁ করিয়া চীৎকার করিতেছিল। গাছের পাতা বাহিয়া এখনও দু'-এক ফোঁটা জল ঝরিতেছে আর সুদূর আকাশে ছিন্ন মেঘের পাশে পাশে গোটা-দুই চিল উড়িয়া উড়িয়া ঘুরপাক খাইতেছে।…সম্মুখে আমবাগানের পাতা-ঝরা পথে পায়ে চলার খস্ খস্ শব্দ হইতেই পরী সেই দিকে তাকাইয়া দেখিল, বৃদ্ধ লামা বাঁশের লাঠি খানি হাতে লইয়া বন্ধুকে শেষ দেখা দেখিবার আশায় যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইতেছে।

৩

একা ঘরে পরীর মন টিঁকিতেছিল না। এই নিঃসঙ্গ জীবনটা কোন রকমে টানিয়া হিঁচড়াইয়া বহন করিয়া লইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে কেমন যেন অসম্ভব বোধ হইতেছিল। ভরা যৌবনের জাগরণ যে তাহার মধ্যে অনেকদিন সুরু হইয়াছে তাহা সে নিজে বেশ ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিত এবং সেইজন্য সময় সময় তাহার মনেও হইত—বিবাহ করিলেও-বা নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে দিনগুলা কাটিতে পারে কিন্তু তাহাও যে সম্পূর্ণ অসম্ভব! পিতৃব্যের কঠোর আদেশ মনে পড়িত, বৃদ্ধের কাতর মিনতির কথা ভাবিতেই কে যেন জোর করিয়া তাহার সে চিন্তার পথটা রুদ্ধ করিয়া দিত।···না—না, বিবাহ সে করিবে না!

সে দিন সন্ধ্যার কিছু পরে, বলদটার মুখের গোড়ায় জাব্‌না ধরিয়া দিয়া, কেরোসিনের ডিবেটা জ্বালিয়া পরী চুপ করিয়া বসিয়াছিল, এমন সময় টুরা ধীরে ধীরে সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। লামা এবং টুরা প্রায় প্রত্যহ আসিয়া তাহার সংবাদ লইয়া যাইত।

টুরাকে বসিতে বলিয়া পরী বলিল, আর তো চাল-ধান কিছুই নাই টুরা, ইবারে কি করব বল্‌ দেখি?

টুরা চালার খুঁটিতে ঠেস্‌ দিয়া বসিল; বলিল, খাদে খাটুতে যাবি?··· পারবি তো?

—হঁ, তা ছাড়া আর কি করব বল্‌?

টুরা কাপড় ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া তাহাকে সেই অন্ধকার গলি রাস্তার মধ্যে আনিয়া বলিল,—হুঁ, সেই কথা বলবি আয়।...আয়, জল্‌দি আয়।

টুরার কণ্ঠস্বরে যেন কত মিনতি-কাতর আগ্রহের ব্যাকুলতা!

পরী কোন কথা না বলিয়া তাহার সঙ্গে ধীরে ধীরে চলিল। কয়েকটা সরু অন্ধকার সুড়ঙ্গের মত গলি-রাস্তা পার হইয়া তাহারা খাদের ভিতর অনেক দূর আসিয়া পড়িল।

কাহারও মুখে কোন সাড়াশব্দ নাই!

টুরা আগে আগে চলিতেছিল। পরী সন্দেহ-দোদুল বক্ষের আলোড়ন ধীরে চাপিয়া তাহার পশ্চাতে!

একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে টুরা হঠাৎ থামিয়া গেল। চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার! পরী বলিল, না টুরা, আমি বিয়া করব নাই।

টুরা কোন কথা না বলিয়া পরীর হাতখানা চাপিয়া ধরিল। কি একটা কথাও বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু পারিল না। শুধু অন্ধকারের মধ্যে দুইটা ব্যাকুল দৃষ্টি জল্ জল্ করিতে লাগিল।

এই নিভৃত নির্জ্জন অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে তাহারা দুইজন! নিশ্বাসের শব্দ, এমন-কি বক্ষের প্রতিটি স্পন্দনও শোনা যায়! টুরার হস্তস্পর্শে পরীর সর্ব্বাঙ্গ যেন কিসের উন্মাদনায় শিহরিয়া উঠিতেছিল! পরী জোর করিয়া একবার তাহার হাতখানা ছাড়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না।...... আর-একবার চেষ্টা করিল, সে-বারেও মনে হইল, শরীরের সমস্ত শক্তি সে যেন হারাইয়া ফেলিয়াছে। পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল!

৪

একটা বৎসর কোন্ দিক্ দিয়া কেমন করিয়া যে সুখ দুঃখের মধ্য দিয়া পার হইয়া গেল, পরী কিছুই বুঝিতে পারিল না।...অনেকদিন অনেক কথাই সে ভাবিয়াছে, কিন্তু কোন কথারই মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারে নাই!

যেদিন হইতে পরী বুঝিল যে, সে কোন্ এক অজ্ঞাত শিশুর জননী হইতে চলিয়াছে, সেইদিন হইতে টুরার প্রতি ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় তাহার মন ভরিয়া উঠিল। নিজের প্রতিও ঘৃণা কম হয় নাই। প্রতি মুহূর্ত্তেই তার আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা হইতেছিল কিন্তু কোন্ অদৃশ্য শক্তি তাহাকে ক্রমাগত সে পাপ হইতে বিরত করিতেছে।

এখন টুরাকে দেখিলেই তাহার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠে, তাহাকে খুন করিতে ইচ্ছা হয়। টুরা স্বামীত্বের দাবী লইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে পরী তাহাকে গালাগালি দিয়া বিদায় করে, কোনদিন বা নিজেই পলাইয়া যায়।

এম্নি করিয়া তাহার দুর্ব্বিসহ জীবন ধিকার এবং আত্মগ্লানির মধ্য দিয়াই কাটিতেছিল, এমন সময় একদিন লামা আসিয়া টুরার সহিত তাহার বিবাহপ্রস্তাব উত্থাপন করিল।

পরীর মনে হইতেছিল, ইহা অপেক্ষা লজ্জা দুনিয়ায় বোধহয় আর কিছুই নাই।...কেন সে মরিতে পারিতেছে না!...কেন?

লামার মুখের সুমুখেই পরী বলিয়া বসিল,—না—কিছুতেই বিয়া করব নাই আমি। তুখে আর সাউকারী মারাতে হবেক নাই বুড়া,—তুই যা।

দিন-মজুর

লামার বহু অনুরোধেও যখন পরীর মন ফিরিল না, তখন অনন্যোপায় হইয়া লামা বলিল,—স্থাখ্ পরী, তুই ত ছেলেমানুষ ন'স। তবে কেনে আমার মুখ পোড়াছিস্। টুরাকে বিয়া করবি কি-না বল্!

পরী জোর করিয়া অসম্মতি জানাইল। বলিল—বিবাহ সে করিবে না। টুরাকে একবার একলা পাইলে সে তাহাকে খুন করিবে, না হয় নিজেই মরিবে।

সেইদিন লামা চলিয়া গেলে, পরী সত্যসত্যই আত্মহত্যা করিবার জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে তিন নম্বর খাদের আগুনের মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ধ্বসিয়া-যাওয়া একটা ফাটল্ বাহিয়া আগ্নেয়গিরির মত অজস্র ধূম ও অগ্নিশিখা হু হু শব্দে নির্গত হইতেছে! পরী সেই ধোঁয়ার মধ্যে প্রবেশ করিতেই তাহার সমস্ত শরীর ঝলসিয়া যাইতে লাগিল।

তাহারই গর্ভে একটি অজাত শিশুর নিষ্কলঙ্ক কচি মুখের কথা মনে হইতেই কে যেন তাহাকে সে আসন্ন মৃত্যু হইতে ফিরাইয়া আনিল। পরী প্রাণপণে ছুটিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দূরে মূর্চ্ছাহত হইয়া পড়িয়া গেল।

৫

কয়েক পশলা বৃষ্টি হইবার পর, বর্ষার মেঘ চারিদিকে থম্ থম্ করিতেছে। আসন্ন-প্রসবা পরী অতিষ্ঠ হইয়া তাহার ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্যে ছটফট করিতে ছিল।

…যেদিকে তাকায়, সেই দিকেই যেন মৃত স্বপনের তীব্রকঠোর দৃষ্টি জল্ জল্ করিতেছে!…অসহ্য যন্ত্রণা! এই বুঝি তাহার শেষ মুহূর্ত্ত!

পরী কোন প্রকারেই নিজেকে সামলাইয়া সে ঘরের বিভীষিকার মধ্যে নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। প্রাণপণে সেখান হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিল। কিয়দ্দুর আসিয়াই দেওয়াল ধরিয়া বসিয়া পড়িল। বাহিরে তখনও ক্ষান্ত-বর্ষণ মেঘের গুরু-গর্জ্জন থামে নাই!

অতি কষ্টে পরী বাহির হইয়া আসিল। হামাগুড়ি দিয়া ধীরে ধীরে সুমুখের আম-বাগানের একটা বৃক্ষের নীচে আসিয়া শুইয়া পড়িল।

যন্ত্রণায় অধীর হইয়া চীৎকার করিতে করিতে কিয়ৎক্ষণ পরে প্রসব হইল। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় প্রসূতি কিছুক্ষণ মৃতের মত পড়িয়া থাকিবার পর চোখ মেলিয়া চাহিতেই দেখিল, তাহারই গর্ভজাত এক পুত্র-সন্তান ধূলি-মলিন ভূমি-শয্যায় লুটাইয়া পড়িয়া কান্না সুরু করিয়াছে।…মেঘের গর্জ্জন থামিয়া গিয়াছে। জলে-ধোওয়া গাছের পাতায় পাতায় রৌদ্রের ছটা চিক্‌মিক্ করিতেছে। এতক্ষণ ধরিয়া বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠতাতের যে শাসন-বাণী স্মরণ করিয়া ক্ষণে-ক্ষণে সে চমকিয়া উঠিতেছিল এবং তাহার শেষ অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারায় যে দুঃসহ যন্ত্রণা তাহাকে প্রতি মুহূর্ত্তেই অস্থির করিয়া তুলিতেছিল, এই সদ্যজাত অরুণালোক-বিধৌত শিশু-সন্তানের কচি মুখের পানে তাকাইয়া পরী যেন নিমেষেই সে সমস্ত ভুলিয়া গেল। শিশুর জন্মক্ষণের পরেই সূর্য্যোদয় হইল দেখিয়া তাহার মনে হইতেছিল, একটু আলোর প্রতীক্ষা না করিয়াই যে চলিয়া গিয়াছে,

আজ সে-ই বুঝি আবার ফিরিয়া আসিল! শিশুর মূর্তিতে আজ তাহার জ্যেষ্ঠতাত দুখনই নিশ্চয় ফিরিয়া জন্মিয়াছে!

একটা মানুষের ছায়া লক্ষ্য করিয়া পরী পশ্চাৎ ফিরিয়া তাকাইতেই দেখিল, সতর্ক পদবিক্ষেপে টুরা কখন্ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সে তাহা বুঝিতেও পারে নাই।

বিদ্রোহিনী নারীর চক্ষে আজ জননীর শান্ত কোমল দৃষ্টি দেখিয়া টুরার কথা বলিবার সাহস হইল; বলিল, ইখানে কেনে পরী, আয়, ঘরকে আয়!

পরী কোন কথা না বলিয়া নাড়ি কাটিয়া ছেলেটাকে দুই হাতে ধরিয়া অতি সাবধানে বুকে তুলিয়া লইয়া ধীরে-ধীরে টুরার পশ্চাতে কুটীরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

বন-বিহগী

দুই হাতের দৃঢ় মুষ্টিতে একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের নামাল ধরিয়া এক সাঁওতাল-যুবতী দুলিতেছিল। দোল্‌না-দোলার তালে তালে তরুণী-কণ্ঠ-নিঃসৃত গানের সুর, অস্তরবির রক্তাভা-রঞ্জিত তরুরাজির পাতায় পাতায় প্রতিহত হইয়া বনানী-প্রান্তে ঘুরিয়া মরিতেছে। সে গাহিতেছিল,—

'বনের মাথায় সোণার আলো,
'আকাশের একদিকে মেঘ উঠেছে,
'আমার দোল্‌না দুল্‌ছে,
'আমি আর গাঁয়ে ফির্‌ব না,—
'হেঁইয়া হো! হেঁইয়া হো!!'

হো, হো,—বলিয়া জোরে ঠেলা দিতেই দোল্‌না উপরে উঠিল, আবার নামিয়া আসিল, আবার উঠিল, আবার নামিল!

অনতিদূরে স্নিগ্ধ শ্যামল তরুছায়াচ্ছন্ন কয়েকটা ক্ষুদ্র পাহাড় এবং

তাহার পাদমূল পরিবেষ্টন করিয়া সুবিন্যস্ত বৃক্ষশ্রেণী, সাঁওতাল-পল্লীটিকে সযত্নে বক্ষে ধরিয়া, প্রান্তরের উপর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

বনৌষধিপূর্ণ পাহাড়ের পাশে, পত্র-পুষ্প সুরভিত অরণ্যের বুকের তলায়, উদার আকাশের সুস্নিগ্ধ শ্যামলিমার নীচে, উন্মুক্ত রবি-শশীর কিরণোদ্ভাসিত প্রান্তরে, শান্তিময় কুঞ্জকুটীর বাঁধিয়া, প্রকৃতির দুলাল, নগ্ন বর্ব্বর অনার্য্যের দল মনের আনন্দে স্বচ্ছন্দ-জীবন যাপন করিতেছে।

দুলিতে দুলিতে চঞ্চল বাতাসে তরুণীর আলুলায়িত কেশগুচ্ছ এবং অসংবৃত অঞ্চলপ্রান্ত দোল্ খাইতেছিল!

অকস্মাৎ পশ্চাতে তাহার দৃষ্টি পড়িতেই দেখিল, কে যেন একটি অপরিচিত লোক সেইদিকে অগ্রসর হইতেছে। লোকটার পরনে সাদা ধুতি, গায়ে রঙিন জামা, হাতে ছাতা ও ছড়ি। তরুণী ভাবিল, এই পরদেশী পথিক বোধ হয় পথ হারাইয়াছে।

লোকটা কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে খেয়ালের ঝোঁকে আরও দুইবার দোল খাইয়া আগন্তুকের মুখের পানে তাহার হরিণের মত কালো স্নিগ্ধ চোখ দুইটি তুলিয়া বলিল,—ও কারিন্ তুহিন্ কানা? (তুই কোথায় থাকিস্ রে?)

লোকটা সাঁওতালীভাষা জানিত না। হাতের ইশারায় বুঝাইয়া দিল, সে তাহার ভাষা বুঝে না, এবং তরুণী যদি তাহাকে তাহাদের গ্রামে লইয়া যাইতে পারে তাহা হইলে ভাল হয়।

হাটের দিনে এখান হইতে প্রায় চার পাঁচ ক্রোশ দূরে একটা গ্রামে তাহারা 'সওদা' করিতে যাইত, কাজেই এখানের সাঁওতাল অধিবাসীরা প্রায় সকলেই একটু-আধটু বাংলা বলিতে পারে।

তরুণী বলিল, তুদের বাংলা আমি জানি। বলিয়াই ফিক্ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া ইসারায় এই পরদেশী পথিককে তাহার পশ্চাতে আসিতে ইঙ্গিত করিল।

এই শ্যামলীয়ার সারাদেহে নিটোল স্বাস্থ্যভরা যৌবনের অম্লান জ্যোতি,—মুখে-চোখে নির্দ্দোষ চপলতা! যুবক পশ্চাতে চলিতেছিল, তরুণী হেলিয়া দুলিয়া চঞ্চলচরণে একটুখানি অগ্রসর হইয়া সহাস্থে কহিল,—কার ঘরকে যাবি?

—তোদের গাঁয়ে মাতব্বর মুরুব্বি লোক কেউ নেই? তার ঘরেই চল্।...আমি কে জানিস্?...পুলিশের লোক।

পুলিশের নাম শুনিয়া রমণী একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। বলিল, ও! বলিয়াই সে পুনরায় চলিতে লাগিল।

অন্য কেহ হইলে হয়ত' একটু চমকিয়া উঠিত, কারণ এই আত্মনির্ভর স্বাধীন বনবাসীর দলও জানে যে, তাহাদেরও আর সেদিন নাই,—তাহাদেরও এখন আইন মানিয়া চলিতে হইবে, না চলিলে পুলিশেরা নাকি সব করিতে পারে, এমন-কি, তাহাদের বনের উন্মুক্ত স্বাধীনতাকেও কারাগারের লৌহ-শৃঙ্খলে বন্দী করিয়া দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। সেইজন্য মাঝে মাঝে এই সরল বিশ্বাসী সাঁওতালদের কাছে পুলিশের নাম করিয়া যাহারাই আসুক না কেন, বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাদের বহুবিধ অত্যাচার এই নিরীহ সাঁওতালেরা মুখ বুজিয়া সহ্য করে।

বৎসর-খানেক পূর্ব্বে পুলিশের নাম ধরিয়া একটা লোক এই গ্রাম হইতে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশজন 'জোয়ান্'কে আসামের চা-বাগানে পাঠাইয়া দিয়াছে।

পরে, আবার আর-একজন আসিয়া, প্রচুর টাকা 'দাদন্' দিয়া লোভ দেখাইয়া, নেশা খাওয়াইয়া, প্রায় ত্রিশজন সাঁওতাল পুরুষ-রমণীকে কয়লা কুঠিতে লইয়া গেছে। ফিরিবার নাম নাই, বরং একে-একে তাহাদের মৃত্যু-সংবাদ গ্রামে আসিয়া পৌঁছিতেছে।

আরও কিছুদিন পূর্ব্বে একজন বাঙ্গালী ক্রিশ্চান পাদ্রি-সাহেব, এই প্রকৃতি-পূজক অসভ্য সাঁওতাল জাতিকে উদার খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া সভ্য এবং শিক্ষিত করিবার সৎ উদ্দেশ্যে একপ্রকার জোর করিয়াই দুইটি গৃহস্থকে আঁধার হইতে আলোকে টানিয়া লইয়া গেছে। সেই নব-মন্ত্র-জাগরিত পরিবারদ্বয় যন্ত্ররাজের চরণতলে জীবনের সুখশান্তি এবং আত্মমর্য্যাদা চিরতরে আহুতি দিয়া এখনও সভ্যতার চরম সীমায় পৌঁছিতে পারিয়াছে কি না কেহ বলিতে পারে না, তবে সম্প্রতি তাহাদেরই মধ্যে একজন নিতান্ত অর্ব্বাচীনের মত পুনরায় এই বন-প্রান্তের পর্ণকুটীরে ফিরিয়া সমাজ-পরিত্যক্ত অবস্থায় বাস করিতেছে মাত্র।

তরুছায়া-শীতল গ্রামে প্রবেশ করিয়া তরুণী একটা গৃহের প্রাঙ্গনে এই নব-পরিচিত অভ্যাগতের জন্য একটা 'খাটিয়া' বিছাইয়া দিয়া কহিল, ব'স্, আমি ডেকে আন্‌ছি।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কুটীরখানির দিকে তাকাইয়া আগন্তুক কহিল, এটা তোর নিজের ঘর নাকি? তোর নাম কি?

—আমার নাম মুক্‌রী আছে। হঁ, ইটি আমার ঘর বেটে। আমার আর কেউ নাই।

—তবে তুই খাস্ কি ক'রে?

মুক্‌রী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কেনে আমাদের কি খাবার ভাবনা আছে নাকি? যার ঘরে পাই, তার ঘরেই খাই।

—তবে তুই কয়লা-কুঠিতে চল্ না? সেখানে দেখবি কত ফুর্ত্তি, কত টাকা, ভা-রি সুখ।

না, না, আর-কেউ যায় ত' ছাখ্, আমি যাব নাই। বলিয়া, মুক্‌রী, সর্দ্দারকে ডাকিবার জন্য ঘরের বাহির হইয়া গেল।

ঘরে প্রাচীরের বালাই ছিল না, কাজেই এই অভ্যাগত সভ্য ব্যক্তিটিকে দেখিবার জন্য দু-একটা ছেলে-ছোক্‌রা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে মুক্‌রী হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিল।

পশ্চাতে বৃদ্ধ সর্দ্দার!

২

বস্তুতঃ, এই বাবুটি যে পুলিশের লোক নহেন এবং রাণীগঞ্জের কাছাকাছি একটা কয়লা-কুঠির সামান্য একজন বেতনভোগী 'রিক্রুটার' (Recruiter) মাত্র, সে-কথাটা একেবারেই গোপন করিয়া পুলিশের গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া পকেট হইতে একটা খাতা ও পেন্সিল বাহির করিয়া কহিল,—কই মুক্‌রী, তোদের সর্দ্দার কোথা? আর—সোনা?

সর্দ্দার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল, সম্মুখে আসিয়া হাত জোড় করিয়া কহিল, এই যে, আমি-গঃ !

এই বলিয়া বৃদ্ধ সর্দ্দার, বাবুর হাতখানা ধরিয়া অনুরোধ করিবার জন্য হাত বাড়াইল। বলিল,—না বাবু, না। লেখিস্ না বাবু। আচ্ছা, সোনাকে আমি ডেকে' দিছি।

বলিয়া দূরে একটা গাছের নীচে একজন সাঁওতাল-যুবকের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া ডাকিল,—হুজুমে হো ! (এখানে আয়)

লোকটা আসিতেছিল, সর্দ্দার কহিল, এই যে সোনা আস্‌ছে বাবু, ...তুঁই খেলি নাই যে। এগুতে খেঁয়ে লে। আমরা কাঁঠালটো ভেঙ্গে দিই।

মুক্‌রী ততক্ষণে তাহার উঠানের কাঁঠাল-গাছ হইতে পাকা একটা কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া আনিয়াছিল। সর্দ্দার কাঁঠালটা ভাঙিতে বসিল। সোনা কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই বাবু বলিল, তোর নামে ওয়ারেণ্ট আছে সোনা। তোকে যেতে হবে।

—হঁ যাব। বলিয়া, সোনা খাটের কাছে বসিল।

বাবু কহিল, সর্দ্দার ! এ যে যাব বল্‌ছে !

সর্দ্দার খুশী হইয়া বলিল, বেশ বেশ। উয়ার যাবার খুশী হয়, যাক্। আমরা সে-রকম জাত লই বাবু—তুঁই ত জানিস। যার যা খুশী, করুক্ —আমরা কিছুই বলব নাই।

বাবু সোনাকে বলিল, তাহ'লে তুই এইখানেই থাক্ সোনা। আজই ভোর রেতে উঠে, আমার সঙ্গে যেতে হবে।...এইখানেই থাক, বুঝলি? ...তা না হ'লে হয়ত রেতে উঠে' বেটা কোথাও পালাতে পারে।

সর্দার বলিল, ক্ষেপেছিস্? পালাবেক্ কি? মুখের কথাটি ব'লে আবার আর-একটি কাজ করবেক? না, না,—তা করবেক নাই, তুঁই দেখে লিস।···তা, তুঁই এইখানেই থাক্ কেনে সোনা! মুকরীর কাছে তো তুঁই থাকিস?

সোনা একবার মুকরীর ঘরের পানে তাকাইল। মুকরী তখন উদাস দৃষ্টিতে সম্মুখে বনের দিকে তাকাইয়া বসিয়াছিল। বনের মাথায় পূর্ণিমার চাঁদ উঠিয়াছে। বনফুল-সুরভিত স্নিগ্ধ বাতাস বহিতেছে! মহুয়া-ফুলের উগ্র গন্ধে মনে হইতেছিল যেন সমগ্র বনানী মাতালের মতন টলিতেছে।

বাবু বলিল, জল কোথা রে! এক গ্লাস জল দে ত'!

বাবুর মুখের পানে তাকাইয়া সর্দার বলিল,—আরও খা বাবু, খেলি নাই যে!...তুরা ত' আমাদের হাতে জল খাবি নাই বাবু,—ওই ঝরুণা থেকে খেঁয়ে আয়-গা।...যারে সোনা, বাবুর সঙ্গে যা। তুইও যা মুকরী একটো বাটি নিয়ে তুইও যা বাবুর সঁথে।

সোনা ও মুকরী বাবুকে সঙ্গে লইয়া গিয়া অদূরে প্রান্তরের পাশে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, ওই ত্যাখ্-গা, ওইখানে জল খুব ভাল।

বাবু দেখিল, বনের ধারে একটা জায়গা একটুখানি খুঁড়িয়া গর্ত্ত করিয়া তাহাতে একটুখানি জল ধরা হইয়াছে। ইহার বিশেষত্ব এই যে, সে স্বচ্ছ নির্ম্মল জলটুকু কখনও ফুরাইয়া যায় না। পাহাড় ও জঙ্গলের অপর প্রান্ত দিয়া যে নদীটি প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, তাহার দূরত্ব কিছু বেশী বলিয়া ইহারা এই সহজ পন্থাটুকু আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে।

কেমন করিয়া এই বর্ব্বর অসভ্যজাতি মাটির নীচে এই অফুরন্ত গুপ্ত জল-স্রোতের সন্ধান পাইল, বাবুটি তাহা ঠাহর করিতে পারিল না। সে

তখন নিজের কর্ম্মসিদ্ধির আনন্দে বিভোর। সে তখন ভাবিতেছিল তাহার নিজের বুদ্ধির কথা। ভাবিতেছিল, কেমন করিয়া বুদ্ধির জোরে এই সব সাঁওতালদের ভুলাইয়া তাহাদের স্বাধীন মুক্ত বন্য জীবনকে কয়লা কুঠির আবিলতায় বন্দী করিতে চলিয়াছে এবং কতগুলা লোক লইয়া যাইতে পারিলে কত টাকা তাহার মিলিবে।

ফিরিবার পথে দেখা গেল, সোনা ও মুক্‌রী ঝগ্‌ড়া আরম্ভ করিয়াছে। সোনা বলিতেছে, তাহাকে যাইতেই হইবে, কারণ এ-স্থানটা তাহার আর ভাল লাগিতেছে না।

মুকরী বলিতেছে, তুই কেনে যাবি?

এই লইয়া বিবাদের সূত্রপাত!

বাবুকে নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়া সোনা বলিল, এই! বাবু আস্‌ছে, চুপ কর্‌!

মুক্‌রী জোর-গলায় বলিল, চুপ করলেই হলো আর-কি! কই, তুঁই যা দেখি!

বাবু জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'লো কি রে তোদের?

মুক্‌রী কি বলিতে যাইতেছিল, সোনা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, ছাখ্‌ ত' বাবু, ই আমাকে বলছে তুদের দেশে যেতে হবেক নাই।

বাবু বলিল, কেন? তোদের দু'জনার এত ভাব কিসের? সোনা তোর কে হয়রে মুকরি?

মুকরী ঈষৎ হাসিয়া সলজ্জ দৃষ্টিতে একবার তাহার মুখের পানে তাকাইয়া কহিল, হঁ রে! উ আমার কে হয় সবাইকে বলে' বেড়াই আর-কি! তুর বেশ আক্কেল ত'!...সোনা আমার কেউ লয়,—হ'লো? তুঁই উয়াকে নিয়ে যাস্ না বাবু, তা হ'লে আমাকেও যেতে হবেক্। আমিও যাব।

শ্যামা বসুন্ধরার শান্তিময় এই নিভৃত নিবাসটুকু ছাড়িয়া সোনাকে যদি অন্য কোথাও যাইতে হয়, ত' সদা-হাস্যময়ী এই মুকরীকেও যে কেন সেখানে যাইতে হইবে, সে-সংবাদ এই পাষণ্ডের অগোচর ছিল বলিয়াই সানন্দে সে বলিয়া উঠিল, বেশ ত' তুইও চল্। এখানের চেয়ে ঢের সুখে থাক্‌বি।

অভিমানিনী তরুণীর কণ্ঠস্বর কান্নায় ভরিয়া উঠিল। বলিল, হঁরে! খুব সুখ! তাথেই যে তুর্ অমন সুখের চেহারা···আমি জানি রে জানি, খুব জানি। তুদের দেশে উ নেশা খেতে শিখে এসেছে, সেই নেশার টানে ছুটছে। আর কিছু লয়।

বাবু কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া কহিল, যাব না বললেই হ'লো কি না,—ওর নামে ওয়ারেণ্ট আছে। সোনাকে যেতেই হবে। তুইও যাবি ত' চল্ আমাদের সঙ্গে।

তাই যাব।—বলিয়া মুকরী হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

৩

কয়লা-কুঠির একটা খড়ো ধাওড়া-ঘরে সোনা, মুকরী এবং আরও দুইজন আসাম-যাত্রী আসিয়া বাস করিতে লাগিল। স্বামী দর্শন প্রার্থিনী হইয়া যে দুইজন সাঁওতাল-রমণী আসাম যাইবে বলিয়া সঙ্গে আসিয়াছিল তাহারা যে প্রতারিত হইয়াছে, সে-কথা গোপন রহিল না। সোনা ও মুকরীর কলহ তখনও মিটে নাই, কাজেই এসব দিকে নজর রাখিবার অবসর তাহাদের ছিল না।

কয়লা-খনিতে আসিয়া প্রথম কয়েকদিন পাতাল-পুরীর সুড়ঙ্গের মধ্যে সোনার সহিত কয়লা কাটিতে মুকরীর বড় আনন্দ হইত। দিবারাত্রির প্রায় সমস্ত সময়টাই হাসি ও গানের কলোচ্ছ্বাসে মুকরী তাহাদের বন্দী-জীবনের অশেষবিধ যন্ত্রণা ভুলাইয়া রাখিত। ভাবিয়াছিল, এমনি করিয়াই কিছু দিন কাটিবে, কিন্তু একদা এক আসন্ন সন্ধ্যায় এই বন-বিহগীর সে মনের ভুল ভাঙিয়া গেল।

সেদিন ম্যানেজার-সাহেবের বাংলোর পাশ দিয়া মুকরী দোকানে 'সয়দা' করিতে যাইতেছিল, এমন সময় সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকারাচ্ছন্ন পথের মাঝে একজন হিন্দুস্থানী চাপরাশী তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—চল্ তুখে সাহেব ডাঁকেছে!

কেন ডাকিয়াছে কিছুই সে জানে না, অথচ অবিশ্বাস করিবার মত মন তাহাদের নয়। মুকরী কোন কথা না বলিয়া চাপরাশীর পিছু-পিছু সাহেবের বাংলোর ভিতর প্রবেশ করিল।

সাহেব মদ খাইয়া রক্তিম-নয়নে একটা চেয়ারের গায়ে হেলান দিয়া চুরুট টানিতেছিল। মুকরী বলিল, কি বল্‌ছিস সাহেব?

সাহেব মুখে কোন কথা না বলিয়া মুক্‌রীর এক খানা হাত দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিল।

মুক্‌রী সবিস্ময়ে বলিল, ই কি? ছাড়্!···

হাতটা সে টানিয়া ছাড়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অসুরের মত বলশালী পশু-প্রকৃতি এই দানবের মুষ্টি শিথিল করিতে পারিল না।

সাহেব আর-একটা হাত দিয়া মুক্‌রীকে জড়াইয়া ধরিতে গেল। মুক্‌রী আর স্থির থাকিতে পারিল না। আত্মরক্ষার জন্য সাহেবের বিরাট উদরের উপর সজোরে এক ঘুসি চালাইতেই সাহেব যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিল, My God!

তাহাকে ছাড়িয়া সাহেব পেকেটে হাত দিয়া তৎক্ষণাৎ চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

মুক্‌রী কাল-বিলম্ব না করিয়া ছুটিয়া তাহাদের ধাওড়ার দিকে চলিয়া গেল।

সোনা বাহিরে উঠানের ধারে দাঁড়াইয়াছিল, মুক্‌রী তাহার হাতে ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল, চলে আয়,—চলে' আয় সোনা, এখানে থাকিস্ না।

মুক্‌রীর হঠাৎ এরূপ ভাব দেখিয়া সোনা একটু বিস্মিত হইয়া কহিল, —কেনে মুক্‌রী, কেনে বল্!

আয়। বলিয়া মুক্‌রী অন্ধকার প্রান্তরের উপর দিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল।

কুঠির সীমানা ছাড়িয়া বহুদূরে আসিয়া মুক্রী থামিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, সোনা, সাহেব আমাকে জোর করে' ধরেছিল। আর কোথাও পালাই চল্।

সোনা বলিল, চল্ তবে। ওই যে খাদের আলো দেখতে পেছিস্ ওই কুঠিতে চল্। বলিয়া দু'জনেই সেই আলো লক্ষ্য করিয়া ছুটিতে লাগিল।

ধাওড়ার কাছে কে একজন কুলী দাঁড়াইয়াছিল, মুক্রী জিজ্ঞাসা করিল, ইখানকার সাহেব কেমন বেটে রে ?

লোকটা বলিল, খুব ভাল সাহেব। কেনে ?

সোনা বলিল, তুদের সর্দ্দারের কাছে আমাদিকে নিয়ে চ দেখি,—আমরা এই খানে কাজ করব।

আয়, বলিয়া, লোকটা তাহাদের কিয়দ্দুর লইয়া গিয়া সর্দ্দারের খড়ো ঘরটা দেখাইয়া দিয়া বলিল, ওই ঘরে যা।

সর্দ্দার জাতিতে সাঁওতাল। বলিল, বেশ। কাল থেকে কাজ করিস্ তুরা। আজ আমার ঘরেই থাক্। কাল তুদিকে একটো ঘর দিব।

সর্দ্দারের বাড়ীতে এই আগন্তুক স্বজাতিদ্বয়ের যত্নের ত্রুটি হইল না। আহারাদির পর মুক্রী বলিল, কিন্তুক সর্দ্দার, আমাদের দু'জনার বিয়া দিতে হবেক্ তুথে। সোনার আর আমার।

সর্দ্দার সম্মতি জানাইয়া কহিল, হঁ দিব। কব্‌কে?…কত টাকা খরচ করতে পারবি?

সোনা বলিল, টাকা কোথা পাব আমরা?

সর্দ্দার ঈষৎ হাসিয়া কহিল, আমি যে বড় গরীব রে! বেশ, তুরা দু'টাকার মদ দিস্, আর আমি কিছু দিব। আট-আনা করে' রাখ্‌লেই চার দিনে দু'টাকা।—বুঝলি?

৪

সামান্য একটা কুলি-রমণীর হস্তে লাঞ্ছিত হইয়া ম্যানেজার-সাহেব একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল।

তৎক্ষণাৎ মুকুরীর সন্ধান করিবার জন্য ধাওড়ায় চাপরাশী পাঠানো হইল, কিন্তু সে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, তাহারা ধাওড়া ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেছে।

সাহেব গোপনে পুরস্কার ঘোষণা করিল, যে তাহাকে ধরিয়া আনিতে পারিবে তাহাকেই দশ টাকা বখ্‌শীস্।

চার পাঁচদিন পরে একজন চাপরাশী আসিয়া সংবাদ দিল যে, তাহারা তপসীর কুঠিতে কাজ করিতেছে, কোন প্রকারেই আসিতে চায় না। বরং ভাল করিয়া তাহাদের আসিতে বলিলে তাহারা উদ্ধতভাবে বলে যে, সুযোগ মিলিলে ম্যানেজার-সাহেবকে খুন করিতেও তাহারা কসুর করিবে না।

সাহেব মদ খাইয়া মাতাল হইয়াছিল, কহিল, আমি নিজেই যাব সেখানে। চল্ তোরা কে যাবি।

তপসীর কুঠি সেখান হইতে মাইল-খানেকের পথ। সাহেব পায়ে হাঁটিয়াই বাহির হইল। লণ্ঠন লইয়া একজন চাপরাশী সঙ্গে চলিল।

সেদিন মুক্রী ও সোনার বিবাহ-উৎসব!

ধাওড়ার প্রায় সমস্ত কুলি-কামিন এই আনন্দে যোগ দিয়া নৃত্য-গীতে ও কলহাস্যে সে স্থানটা মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। সম্মুখে তাহাদের ম্যানেজার-সাহেবের 'বাংলো'-বাড়ী হইতে একটা বিলাতি কুকুরের অবিশ্রান্ত চীৎকার শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। এই উৎসব-গীতি-মুখর প্রান্তরের মধ্যে কুকুরের কর্কশ কণ্ঠ নিতান্ত বেসুরা শুনাইলেও উপায় নাই। সাহেবের কুকুর!

সাহেবের নিদ্রায় ব্যাঘাত হইতেছিল বলিয়া একটা খান্সামা আসিয়া সংবাদ দিল, ওরে সর্দ্দার, তোরা আজকার মতন গান থামা,—সাহেবের ঘুম হচ্ছে না।

মুক্রী বলিয়া উঠিল, বা রে? আমরা গায়েন্ করছি, ও করতে দিবি নাই, আর সাহেবের কুকুরটো যে চেঁচাচ্ছে, তার বেলায়?

খান্সামা বলিল, সাহেবের কুকুর একশ'বার চেঁচাবে, তাই বলে' তোরাও চেঁচাবি নাকি?

—হঁ, গায়েন্ করব। তুই বল্‌গা তুর সাহেবকে।

বলিয়া মুক্‌রী ঈষৎ হাসিয়া, তাহার খোঁপা হইতে লাল পলাশের একটা ফুল তুলিয়া লইয়া খানসামার গায়ের উপর ছুঁড়িয়া মারিল।

পশ্চাৎ হইতে হঠাৎ মুক্‌রীর পিঠের উপর সজোরে একটা চাবুক আসিয়া পড়িতেই সে ফিরিয়া দেখিল, আগেকার কুঠির সেই দুর্ব্বৃত্ত ম্যানেজার সাহেব কখন্ তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে!

তাহাকে দেখিয়া এবং চাবুকের ঘা খাইয়া মুক্‌রীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া কহিল,—সোনা, এই সেই সাহেব,—মার্ ইয়াকে।

বলিয়া সদর্পে একটা ঘুসি উঁচাইয়া মুক্‌রী সাহেবের দিকে অগ্রসর হইল।

ইতিমধ্যে সকলেরই দৃষ্টি তখন সাহেবের উপর পড়িয়াছে।

সোনা একটা লাঠির সন্ধানে এদিক-ওদিক তাকাইতেছিল। সাহেব হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া মুক্‌রীর উদ্যত হস্তের উপর আর-এক ঘা চাবুক বসাইয়া দিল। মুক্‌রী এইবার প্রাণপণে অগ্রসর হইয়া সাহেবের বুকের উপর লক্ষ্য করিয়া আবার এক ঘুসি তুলিল, কিন্তু সে-আঘাত সাহেবের গায়ে লাগিবার পূর্ব্বেই সাহেব পকেট হইতে গুলিভরা পিস্তলটা বাহির করিয়া মুক্‌রীর বুকের উপর ধরিয়া আওয়াজ করিয়া দিল। ভীষণ একটা শব্দ হইল এবং সঙ্গে-সঙ্গে বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া মুক্‌রী মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

সোনা একটা লাঠি হাতে লইয়া সাহেবের দিকে ছুটিয়া আসিতেছিল, সর্দ্দার তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া নিষেধ করিল।

মুক্‌রী কিয়ৎক্ষণ হাত-পা ছুঁড়িয়া ধূলার উপর ছট্‌ফট্ করিল, পরে

রক্ত-রঞ্জিত দেহে উৎসব-ক্ষেত্রের একপার্শ্বে নিস্তব্ধ হইয়া গেল! তাহার শিথিল কবরীমুক্ত রক্ত-পলাশের গুচ্ছগুলি তখন ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আজ তাহার বিবাহ-উৎসব!

একে ত' ইহাদের চীৎকারের চোটে এখানকার ম্যানেজার-সাহেবের ঘুম আসিতেছিল না, তাহার উপর অকস্মাৎ একটা গুলি ছোঁড়ার শব্দে চমকিত হইয়া সাহেব তাড়াতাড়ি বাংলোর বাহিরে আসিতেই দেখিল, ত্রস্তপদে ময়নাটুলির ম্যানেজার-সাহেব সেইদিকেই আসিতেছে! পরস্পরের মধ্যে আলাপ আপ্যায়িত হইল, কথাবার্ত্তা হইল, পরামর্শ হইল এবং আরও যে কত-কি হইল তাহা একমাত্র অন্তর্য্যামীই জানেন।

পরদিন প্রাতে সোনাকেও আর সেখানে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। মরিল কি কোথায় গেল কে জানে।

কিন্তু সেই বন-প্রান্তের কুটীর হইতে যে বাঙ্গালী বাবুটি পুলিশ সাজিয়া গিয়া তাহাদের ধরিয়া আনিয়াছিল, মুকরীর মৃত্যু-সংবাদ সে 'রিক্রুটার' বাবুটি শুনিল কিনা বলিতে পারি না।

অভাগীর শোচনীয় পরিণাম-কাহিনী, বনানী-পরিবেষ্টিত গিরিনদী পার হইয়া, শ্যামা বসুন্ধরার সেই নিভৃত কুটীরবাসী নিরীহ সাঁওতালদের কাছে গিয়া কোনদিন পৌঁছিতে পারিবে কি না তাহাও জানি না, তবে এইটুকু মাত্র বলিতে পারি যে, পর দিন প্রভাতে এ-সম্বন্ধে কোথাও কোন আন্দোলন দেখা গেল না,—এখানকার কাক-পক্ষীর নিকটেও মুকরী ও সোনার অকস্মাৎ অন্তর্ধানের ইতিহাস অগোচর রহিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে কুঠির 'সিটি' বাজিল, কুলি-কামিন আসিয়া জড়ো হইল, সশব্দে ইঞ্জিন চলিল এবং কাতারে কাতারে সাঁওতাল পুরুষ-রমণী কাজ করিবার জন্য খাদে গিয়া নামিল।

ওদিকে পূর্ব্বদিকচক্রবাল উদ্ভাসিত করিয়া প্রতিদিনের মত সূর্য্যও উঠিল এবং রক্ত-রাঙা পলাশের বনে অবিশ্রান্ত কণ্ঠে দু'একটা কোকিলও ডাকিতে সুরু করিল।

বন্দী

কয়লাখা'দর নীচে অন্ধকারের অন্ত নাই। মাথার উপরে পায়ের নীচে, দুই পার্শ্বে, সম্মুখে, পশ্চাতে,—যে-দিকে তাকাও শুধু কয়লা আর কয়লা! অন্ধকার পাতাল-গহ্বর! তাহারই এক জায়গায় জন-পঁচিশেক্ সাঁওতাল কুলী কয়লা কাটিতেছিল। সম্মুখে কয়লা-স্তরের গায়ে কয়েকটা কেরোসিনের 'মগ' প্রচুর ধুম উদ্গীরণ করিয়া জ্বলিতেছে। তাহারই সামান্য আলোকে লোকগুলাকে চিনিতে পারা যাইতেছিল মাত্র। তাহাদের মাথার চুল হইতে পদ-নখর পর্য্যন্ত কালো কয়লার রঙে মিশিয়া গেছে। অদূরে কয়েকজন কুলী-রমণী ঝুড়ি মাথায় দিয়া টব-গাড়ীতে কয়লা বোঝাই দিতেছে। তাহাদেরও মলিন বসন কয়লার ময়লায় আরও মলিন হইয়া উঠিয়াছে। গাত্র এবং বস্ত্র মলিন হইলেও, অমলিন একটা আনন্দের ধারা তাহাদের কথায় বার্ত্তায়, হাসিতে গানে, ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

ওদিকে সাঁওতাল 'জোয়ান্'দের গাঁইতির চোট্ সমানভাবেই চলিতেছে। দুই হাতের দৃঢ় মুষ্টি এতটুকু শিথিল হয় নাই,—মুখে হাসি নাই,

কথা নাই, মাথার ঘাম হাত দিয়া মুছিবার অবসরটুকু পর্য্যন্ত নাই,—অক্লান্ত পরিশ্রমে তাহারা মানবশক্তির জয় প্রতিষ্ঠা করিতেছে! প্রকৃতির দুলাল এই-সব নগ্ন অসভ্য বর্ব্বর সাঁওতাল, গায়ের রক্ত দিয়া, প্রাণ দিয়া, —মনের ক্ষোভ আর পেটের দায়ে মাতা বসুন্ধরার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া চলিয়াছে! কত শত পল্লী পাতাল-গহ্বরে বসাইয়া দিয়া, তাহাদের শ্যামলশ্রী জনশূন্য শ্মশানে পরিণত করিয়া, মানব-সভ্যতার রক্ত-নিশান উড়াইয়া একে একে তাহারা প্রাণ দিতেছে!

তাহাদের দলের মধ্যে একজন বৃদ্ধ সাঁওতাল কয়লা কাটিতে কাটিতে একটুখানি বিশ্রাম করিবার জন্য কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইল। হাতে তাহার শক্তি নাই, চোখে ভাল নজর চলে না,—তবু প্রত্যহ খাটিতে আসে। না আসিলে চলে না। সংসারে খরচ অনেক। সে নিজে, বৃদ্ধা স্ত্রী, দুইটা জোয়ান্ ছেলে, আর এক যুবতী কন্যা। ছেলে-মেয়ে তাহার অনেক ছিল, কিন্তু একটি একটি করিয়া সাতটি ছেলে এই কয়লা খাদের ভিতরেই মরিয়াছে,—বাকী আছে মাত্র তিনটি। তিনজনের মধ্যে একটা ছেলে খোঁড়া হইয়া গেছে; সে আর কাজ করিতেও পারে না,—লাঠি ধরিয়া তাহাকে চলিতে হয়। বাকী, পানুটু ও নিশি, দুই ভাই-বোন সমস্ত দিন খাটিয়া যাহা-কিছু রোজগার করে তাহা দিয়া পাঁচটি জীবের খোরাক চালানো একপ্রকার অসম্ভব। কাজেই বৃদ্ধ সুখন মাঝি কাহারও নিষেধ না শুনিয়া মাঝে-মাঝে খাটিতে আসে। আজও আসিয়াছিল।

সুখন কোমরে হাত দিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। দেখিল, তাহার পুত্র পানুটু অন্যান্য সকলের সহিত প্রাণপণে কয়লা কাটিতেছে,

—কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই! সে তার প্রাণ দিয়া শক্তি সামর্থ্য দিয়া, বৃদ্ধ পিতামাতা এবং ভাই বোন্ দুটিকে বাঁচাইয়া রাখিতে চায়!

সুখন ডাকিল, পান্টু!...

কিন্তু শ্রম-ক্লান্ত বৃদ্ধের ক্ষীণ কণ্ঠ কয়লাকাটা গাঁইতির শব্দে মিশিয়া গেল। পান্টু শুনিতে পাইল না।

সুখন দৃঢ়মুষ্টিতে আর একবার গাঁইতিটি তুলিয়া লইয়া কাজ করিতে যাইতেছিল, এমন সময় নিশি কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া পিতার হাত হইতে গাঁইতিটা কাড়িয়া লইল। বলিল, লাব্‌বি ত' কেনে কাট্‌ছিস বাবা?... ... যা তুঁই ধাওড়ায় যা!

আর ঝুড়ি-তুই। বলিয়া সুখন্ গাঁইতি তুলিয়া কয়লায় চোট মারিল।

পান্টু বেশী দূরে ছিল না। নিশি ডাকিল, দাদা, ও দাদা!

পান্টু নিশির মুখের পানে না তাকাইয়াই বলিল,—কি?

নিশি তাড়াতাড়ি তাহার কাছে আগাইয়া গিয়া কহিল, বুড়া খেটে' খেটে' মর্‌বেক্, আর তুঁই উয়াকে বারণ কর্‌বি নাই,......লয়?

পান্টু আপন মনে কয়লা কাটিতে কাটিতে বলিল, কে উয়াকে খাট্‌তে বল্‌ছে নিশি,—তুঁই উয়াকে উঠোঁই দে কেনে।

আমি লার্‌ব। বলিয়া নিশি চলিয়া যাইতেছিল। পান্টু গাঁইতিটা নামাইয়া রাখিয়া বলিল, দাঁড়া, আমি বল্‌ছি।

বৃদ্ধ পিতার নিকট অগ্রসর হইয়া পান্টু তাহার হাত হইতে গাঁইতিটা কাড়িয়া লইল। বলিল, যা, উঠ্‌ ইবারে। ঘরকে যা।

সুখন কোন কথা না বলিয়া ধীরে-ধীরে চলিয়া গেল।

নিশি এইবার হাসিতে হাসিতে ঝুড়িটা মাথায় তুলিয়া লইয়া বলিল, দেখলি ?......হঠাৎ সুমুখের দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল, হ ছাখ্ পাণি আস্‌ছে !

পাণি তাহাদেরই ধাওড়ার একটা সাঁওতালের মেয়ে।

কই ? বলিয়া, পানটু সেই দিকে তাকাইতেই দেখিল, পাণি হাসি-মুখে তাহাদেরই দিকে অগ্রসর হইতেছে।

পাণিকে দেখিয়া পানটু হাসিয়া কি-একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সে তাহার আগেই পানটুর হাতখানা ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল, আয়, আয়, শুন্।...নিশি, তুঁই-ও আয়।

একটু দূরে গিয়া পাণি চুপি-চুপি বলিল, শুনেছিস্ পানটু, সে-ই তারা এসেছে।

নিশি জিজ্ঞাসা করিল, কারা পাণি ?

—সেই, সে···ই,—যারা আমাদের মাইনা বাড়াই দিব বলেছিল, মদ খেতে ছ্যায় নাই, আর সেই মোটা কাপড়।···ভুলে' গেইছিস্ ?··· সেই উ-বছর।

পানটু আগ্রহ সহকারে বলিল, কার কাছে শুনলি পাণি ?···তুঁই তাদিকে দেখে এলি নাকি ?

পাণি বলিল, হঁ হঁ, সকাল-সকাল যেতে হবেক্ চল্।···আমি দেখে এলম, উয়াদের সাথে আরও দুটো মেয়ে এসেছে,—খুব সুন্দর ! ঠিক দুগ্‌গো পিতিমের মতন। আর সাড়ী পরেছে—ইয়া গধড়্।*

* মোটা

দিন-মজুর

পানটু বলিল, যা তুঁই।...এক টব বোঝাই দিয়েই যাব আমরা।

'কলিয়ারী'র কর্মচারীদের যে 'মেস্'টা ছিল, তাহারই অনতিদূরে এক বিস্তৃত প্রান্তরের উপর, সেদিন অপরাহ্ণে এক বিরাট জনসভা আহূত হইল। শ্রোতাদের মধ্যে অধিকাংশ সাঁওতাল পুরুষ-রমণী। জনতার এক প্রান্তে কয়েকটা চেয়ারের উপর তিনজন মহিলা এবং প্রায় ছয়-সাতজন পুরুষ বসিয়াছিলেন। তাঁহারা কয়লা-কুঠির শ্রমিক-সম্প্রদায়ের সুখ-দুঃখের কথা জানিবার জন্য আসিয়াছেন।

প্রথমেই একজন যুবক একটা কেরোসিন-কাঠের বাক্সের উপর দাঁড়াইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। সাঁওতালেরা উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল।

—তোমাদের দুঃখের কথা আমরা জানি। তোমরা বড় গরীব।

একজন বৃদ্ধ সাঁওতাল বলিয়া উঠিল, হঁ, বল্ বাবু বল্—তুরা না বল্‌লে আর কে বল্‌বেক।

পাশের একটা লোককে খোঁচা দিয়া বলিল, এই! শুন্‌ছিস্?

তিনি আরও বলিতে লাগিলেন, তোমরা দিবারাত্রি পরিশ্রম কর, অথচ দুবেলা পেট ভরে খেতেও পাও না। তোমরা একদিন কাজে না গেলে কোম্পানীর কুঠি বন্ধ হয়ে যাবে। তোমরা তাদের কাজ করে' দাও,—তারা তোমাদের পরিশ্রমের দাম দেয় না। আচ্ছা, তোমরা এক কাজ কর না—?

সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল, কি, কী কাজ ?

—একদিন কেউ কাজে যেও না। সাহেব ডাকতে এলে বোলো আমাদের হাজ্‌রির পয়সা না বাড়ালে আমরা খাটব না।

কয়েকজন বলিল, খাব কি ? একদিন কাজে না গেলে যে উপোস্ দিতে হবেক্।

—একদিন না-হয় উপোস্ দিয়েই থাকবে।

জনসভার মধ্য হইতে একজন রমণী, একটি তিন-চার বছরের ছেলেকে দেখাইয়া বলিল, আমরা না-হয় উপোস্ দিলুম ; কিন্তুক্ ই পারে ?…বল্, তুরাই বল্ কেনে বাবু।

পরিমলবাবু, বসুন ; এইবার আমি বলি। বলিয়া, একজন মহিলা চেয়ার ছাড়িয়া ধীরে-ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। খদ্দর-বিভূষিতা দিব্য সৌম্য শান্ত এক রমণীমূর্ত্তি ধীরে-ধীরে পরিমলের স্থান অধিকার করিয়া দাঁড়াইলে পর, শ্রোতারা সকলেই একদৃষ্টে তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

একজন কুলীরমণী বলিল, হঁ,—আমাদের দুঃখু-কষ্ট তুঁই ঠিক জানিস্ বোন্! উ জানে না।

রমণী অনুচ্চ-কণ্ঠে কহিলেন,—না ভাই, তা হয়ত' ঠিক জানি না। তবে উপোস্ দিতে বলব না। অনেক উপোস দিয়েছ, এবার না খেলে মরে যাবে।…আচ্ছা, তোমরা সবাই মদ খাও,…নয় ?

—হঁ, খাই।

—ছাড়তে পার না ?

পানুটু খানিক্ ভাবিয়া বলিল, দুবেলা পেট ভরে' খেতে পেলে পারি।

রমণী কহিলেন, মদ তোমরা অনেক খাও। সেই পয়সার চাল, ডাল কিনো। মদ তোমাদের ছাড়তেই হবে। তা যদি না পার, তা'হলে আমি আর-কিছু বলব না।

কয়েকজন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, ছাড়ব। আমরা সবাই ছাড়ব। তুঁই বল্।

—দিব্যি কর, শপথ কর,—বল, মদ আর কখনো ছোঁব না।

সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিল, বোঙার (দেবতার) নামে কিরা+ করে' বলছি মদ খাব নাই।

রমণী আবার কহিলেন,—তোমাদের মধ্যে যারা বিলাতি কাপড় পরে' আছ, এক্ষুণি সে-সব খুলে ফেলে পুড়িয়ে দিতে হবে।

একজন যুবক বলিল, আমরা সবাই তাঁতিঘরের কাপড় পরি।

—আর, এই যে এ বিলিতি কাপড় পরে' আছে। বলিয়া তিনি একজন রমণীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

সে বলিল, ইয়ার দাম যে খুব সুবিস্তা।

কথাটা শুনিয়া জনতার মধ্যে এক বৃদ্ধা অত্যন্ত সত্রস্ত হইয়া উঠিল। পাঁশে তাহার যুবতী কন্যা একখানা বিলাতি কাপড় পরিয়া বসিয়াছিল। বৃদ্ধা বলিল, চুপটি করে' লুকোঁই বোস্,—যেমন উ দেখতে না পায়।

কিন্তু এই হাস্যকর ব্যাপারটা বক্তৃতাকারিণীর চক্ষু এড়াইল না। মেয়েটাকে হাতের ইসারা করিয়া বলিলেন, শোন্!

মেয়েটি সলজ্জ সঙ্কোচে ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইয়া গেল। বলিল,

+ শপথ

আমি বাবুদের বাসায় কাজ করি বলে' তারা আমাকে এই কাপড়টা দিয়েছে। আমার আর যে কাপড় নাই!

—সত্যি বোল্‌চ?

—একটা কাপড়ের লেগে মিছা কথা বলতে আমার কি গরজ?

রমণী তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট যুবককে ইঙ্গিত করিতেই তিনি খদ্দর কাপড়ের একটা গাঁটরি খুলিয়া, একখানি মোটা সাড়ী মেয়েটির গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া বলিলেন, নাও।

সে খুশী হইয়া চলিয়া গেল।

এইবার তিনি প্রসঙ্গ-ক্রমে অন্য কথা পাড়িলেন। বলিলেন, সেই পাহাড়, পর্ব্বত আর জঙ্গল ছেড়ে এসে তোমরা ভাল কাজ করনি। সেখানে তোমাদের কোন অভাব ছিল না—বেশ ছিলে। কেন মিছে মরবার জন্যে এখানে এসেছ ভাই-বোনেরা আমার! এই পাতাল পুরীতে হাড়-ভাঙা খাটুনী খেটে তোমরা খেতে না পেয়ে মরে' যাবে। তোমাদের ওই স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য কিছুই থাকবে না। কয়লার চাপে তোমরা যে কত মরেছ, তার খবর রাখ কি?

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই, তিনি এক বৃদ্ধা সাঁওতাল-রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ক'টি ছেলে-মেয়ে এই খাদে মারা গেছে মা?

বৃদ্ধা ধরা-ধরা গলায় বলিল, আমার লখাই আর দাসী মরেছে।

তোমার ক'টি মরেছে? বলিয়া অপর পার্শ্বে আর-একজন বৃদ্ধার দিকে মুখ ফিরাইতেই সে কহিল, আমারও একটি। জোয়ান্ ছেলে মা, —তুঁই যদি দেখতিস তাকে—

আর তোমার? বলিয়া রমণী যাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে

গিয়া থমকিয়া চুপ করিল, সে পানুটুর বৃদ্ধ পিতা—সুখন। সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তখন তাহার চক্ষু বাহিয়া দর দর ধারে অশ্রু গড়াইতেছে। সে-ই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দিয়াছে বলিয়া মনে হয়। একটি বৎসরের মধ্যে তাহার সাতটি সন্তান চলিয়া গেছে, আর একটির পা ভাঙিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া আছে। বুকের রক্ত দিয়া যাহাদের মানুষ করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাদের ভীষণ হত্যাদৃশ্য হইতে আরম্ভ করিয়া, এক-একখানি হারা-মুখের প্রতিকৃতি, বৃদ্ধের জলভরা ঝাপ্‌সা চোখের সুমুখে শূন্য বায়ুস্তরের উপর ফুটিয়া উঠিতেছিল। মুখ ফুটিয়া সুখন কিছুই বলিতে পারিল না। রমণীও এই শোকসন্তপ্ত বৃদ্ধ পিতার দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া নিশ্চল প্রস্তরমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছিল। সেদিনের মত সভা ভঙ্গ হইল। কুলিদের তরফ হইতে তাহাদের হাজিরা বাড়াইবার জন্য কর্ম্মীসঙ্ঘ, ম্যানেজার-সাহেবকে অনুরোধ করিলেন। সাহেব মুখে খুব আশ্বাস দিয়া বলিলেন, হেড-আফিসে জানাইয়া তিনি নিশ্চয়ই ইহার একটা-কিছু বন্দোবস্ত করিবেন।

তাঁহারা সেই রাত্রেই অন্য কুঠিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সাহেব দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, সেখানে যাইবার রাস্তা তেমন ভাল নয় বলিয়া তিনি মোটর দিতে পারিলেন না, নচেৎ কোম্পানীর মোটরে তাঁহাদের সেখানে পৌছাইয়া দিতে পারিতেন।

কয়েকজন সাঁওতাল-যুবক লাঠি ও লণ্ঠন হাতে লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা বলিল, তুদিকে একা ছেড়ে দিব নাই। চল্ আমরা বাগান পার করে' দিয়ে আসি।

দিন-মজুর

অনেকদিনের পুরাতন কুঠি,—তাহার উপর যেখানে-সেখানে 'পিলার্ কাটিং' চলিতেছিল। উপর্যুপরি কয়েকটা লোক খাদের নীচে খুন হইলে পর, হঠাৎ ম্যানেজারের কাছে উওরওয়ালার এক হুকুম আসিল, একমাত্র বলিষ্ঠ পুরুষ ছাড়া কোন মেয়ে-ছেলে খাদের নীচে কাজ করিতে পারিবে না।

সংবাদটা শুনিয়া পানটু ভাবিয়া অস্থির হইল। তাহার বোন নিশি যদি খাদে নামিতে না পায়, তাহাহইলে তাহার একা রোজগারে দুবেলা পাঁচটা লোকের পেট কেমন করিয়া ভরিবে? খাদের উপরে এখন এমন কোন কাজ নাই, যেখানে খাটিয়া নিশি কিছু রোজগার করিতে পারে। কাজেই প্রথম দিন সুখনের সংসারের পাঁচটি প্রাণী একবেলা উপবাস দিয়া কাটাইল।

এ-দিকে কামিন না নামিলে কোম্পানীর সমূহ ক্ষতি। কাজেই পরদিন ম্যানেজার-সাহেব স্থির করিলেন, গোপনে ডবল-হাজরির প্রলোভন দিয়া রাত্রে কামিন নামাইতে হইবে।

ফলে তাহাই হইল। রাত্রে উপবাস দিয়া পেটের দায়ে, অন্যান্য কুলি-কামিনদের সঙ্গে, পানটু ও নিশি খাদে নামিল।

কিন্তু বেদনা দুর্ভোগ যখন আসে তখন একা আসে না।

দিন-মজুর

রাত্রি তখন কত,—খাদের নীচে সে খবর জানিবার উপায় নাই। গাঢ় অন্ধকারের ভিতর টিম্‌টিমে কয়েকটা মগবাতি জ্বলিতেছিল। নিশি যেখানে কাজ করিতেছিল, পানটু সেখানে ছিল না। খাদের উত্তর সীমানায় 'চাঁদ্‌নি ঝাড়াই' চলিতেছিল। 'পিলার্‌-কাটিং'এর পর, উপরের ছাদটাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য শাল-কাঠের যে 'প্রপ্‌'-গুলা আটকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেগুলা টানিয়া লওয়া হইল।

কয়লার একবিন্দু চিহ্ন ত' কোথাও রাখিবেই না, উল্টা কাঠগুলা আট্‌কানো থাকিলে উপরের ছাদটা হয়ত না ধ্বসিতেও পারে; কিন্তু তা-ই বা কেন? কাঠগুলাও ছাড়াইয়া লওয়া চাই!

সর্দ্দার বলিল, ছাত্‌ পড়তে এখনও অনেক দেরী। নে, কয়লাগুলা সব ঝপাঝপ্‌ সরিয়ে নে। বলিয়া, সে অন্যত্র চলিয়া গেল।

নিশির সহিত আরও কয়েকজন কামিন কয়লা সরাইতেছিল।

দেখিতে দেখিতে চড়্‌ চড়্‌ করিয়া ওজন্‌ আসিল। ছাদ ধ্বসিতেছে! পালাও! পালাও! হঠাৎ ছাদ হইতে বড় বড় পাথর ছাড়িতে আরম্ভ হইল।

হাত দশ-বারো দূরে প্রকাণ্ড একটা পাথর পড়িল।

আবার একটা!

আবার আর-একটা!

অন্যান্য সকলে দৌড়িয়া পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইল, কিন্তু নিশি আর ফিরিল না। সে কয়লা-বোঝাই ঝুড়িটা মাথায় তুলিতে যাইবে, এমন সময় একটা পাথরের চাংড়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চালটাই হুস্‌ করিয়া নামিয়া আসিল। নিশি তাহার ভিতরেই কোথায় রহিল, কেহ জানিল না।

পানটু সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখে, চালের বিরাট পাথর-গুলা স্তরে-স্তরে নীচে বসিয়া গেছে। নিশির চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত দেখিবার উপায় নাই। পানটুর চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত পড়িল না। উপবাসের পর মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া ঘুরিতেছিল। সেইখানেই সে চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

সঙ্গে সঙ্গে সাহেবকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। একে ত' 'মাইন্স-ইন্সপেক্টরের' হুকুম অমান্য করিয়া খাদের নীচে কামিন নামানো হইয়াছে, তাহার উপর খুন! সাহেব যেমন অবস্থায় ছিলেন, ঠিক সেই অবস্থাতেই ছুটিয়া আসিলেন। খুন গোপন করা ছাড়া উপায় নাই। জানাজানি হইলেই সর্ব্বনাশ!

সাহেব ধীরে-ধীরে পানটুর হাতে ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন, কি আর করবি, কাউকে বলাবলি করিস না, বুঝলি?

পানটু ঝিম্ মারিয়া হেঁট মুখে তখনও তেম্‌নি বসিয়াছিল। সাহেব বলিলেন, আয়, আমার বাংলোতে আয়।

সাহেবের হুকুমমত সংবাদটা গোপন রাখিবার জন্য সকলকে বলিয়া দেওয়া হইল।

বাংলোর একটা নিভৃত কক্ষে পানটুকে লইয়া গিয়া সাহেব অনেক বুঝাইলেন; বলিলেন, মরে' যখন গেইছে, তখন কি কোর্‌বি আর?

পানটু নীরবে বসিয়া রহিল।

—ব'স্ এইখানে, আমি আসছি। বলিয়া সাহেব বাহির হইয়া গেলেন।

দিন-মজুর

পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া পানটুর হাতে পঞ্চাশটা টাকা গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন, এই নে।

পানটু টাকাগুলার দিকে একবার তাকাইল। একটা টাকা হইলে আজ তাহারা সকলে মিলিয়া খাইয়া বাঁচে, তাহার উপর,—পঞ্চাশ!

পানটু ধীরে-ধীরে টাকাগুলা তুলিয়া লইয়া কোন কথা না বলিয়া, নীরবে বাংলোর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

...অন্ধকারের মধ্যে বড় বড় গাছগুলা প্রেতমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া আছে। পাতায় পাতায় জোনাকির আলো!

সে আপন মনে নিশির কথা ভাবিতে ভাবিতে ধাওড়ার কাছে আসিয়া পৌছিল। বুড়ো বাপকে কি বলিয়া বুঝাইবে?...আর তার বুড়ী মাকে?...পানটুর চক্ষু ছাপাইয়া এতক্ষণে অশ্রুর ধারা গড়াইয়া আসিল।

অতি সঙ্গোপনে ধাওড়ার উঠানে গিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল, ভগিনীর মৃত্যুসংবাদ ইহারই মধ্যে প্রচারিত হইয়া গেছে। তাহার বৃদ্ধ মাতাপিতা এবং অকর্ম্মণ্য ছোট ভাইটি মাটিতে লুটাইয়া কান্না সুরু করিয়াছে। একটা 'মগ'-বাতি জ্বালিয়া, চৌকাঠের কাছে পাণি বসিয়া আছে। অন্যান্য যে সব কুলি-কামিন কিছু পূর্ব্বে খাদ হইতে উঠিয়া আসিল, তাহারাও উঠানের উপর বসিয়া বসিয়া বোধ হয় এই নিদারুণ সংবাদের আলোচনাই করিতেছিল।

পানটুকে দেখিয়াই বুড়া সুখন কাঁদিয়া উঠিল। অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, নিশিকে কোথা রেখে এলি পানটু?

পানটু নির্ব্বাক! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চৌকাঠের পাশেই

সে বসিয়া পড়িল। তাহার মা আরও জোরে-জোরে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, শোকের প্রথম বেগ খানিকটা শান্ত হইলে পর, সাহেবের-দেওয়া টাকা ও নোটগুলা পান্টু তাহার পিতার হাতের কাছে ধরিয়া দিয়া বলিল, সাহেব দিলেক্।

দপ করিয়া যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। বৃদ্ধ চোখদুইটা তাহার যথাসম্ভব বিস্তৃত করিয়া পান্টুর মুখের পানে তাকাইয়া কহিল, কে দিলেক?… সাহেব?…নিশির দাম? আর তুঁই তাই লিলি হাত পেতে?

পান্টু নীরবে ঘাড় নাড়িল।

সুখন হাতের ইসারা করিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, কুন্ লজ্জায় লিলি তুঁই পান্টু? যা—এখনই তুঁই। এখনই ফিরে দিয়ে আয়-গা। যা,—যা বলছি পান্টু!

পান্টু ধীরে-ধীরে টাকাগুলি তুলিয়া লইয়া যেমন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রবেশ করিয়াছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই বাহির হইয়া গেল। বাহিরে আসিয়া ডাকিল, পাণি আয়।

পাণি উঠিয়া আসিল।

শেষরাত্রির ধূসর অন্ধকারে গাছপালাগুলা তখন একটুখানি স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

আম-বাগানের ভিতর দিয়া অন্ধকার সরু পথের মাঝে পানটু ও পাণি সাহেবের বাংলোর দিকে চলিতেছিল। কিয়দ্দুর আসিয়া পানটু ডাকিল, পাণি!

পাণি তাহার পাশে থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, উঁ।

পানটু তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া একদৃষ্টে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। প্রভাতের উজ্জ্বল শুক-তারাটি পাতার ফাঁকে পাণির মুখের উপর জল্ জল্ করিয়া জ্বলিতেছে।···পানটুর চোখ দুইটা জলে ছাপাইয়া আসিয়াছিল। পাণিরও গণ্ড বাহিয়া দুটি অশ্রুর ধারা গড়াইয়া পড়িল। পানটু প্রাণপণে তাহার হাতখানা একবার জোরে চাপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতে গিয়া বুঝিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া গেছে,—গায়ে যেন এক ফোঁটা জোর নাই!

পাণিও কম্পিত হস্তে পানটুর হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল—চল্।

সাহেবের বারান্দায় উঠিতেই একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল।

পানটু রুদ্ধ দরজার কাছে গিয়া ডাকিল,—সাহেব!

কয়েকবার ডাকাডাকির পর খান্‌সামা বাহিরে আসিয়া বলিল,—কে রে? কি বল্‌ছিস্?

পানটু বলিল, সাহেব কই? উঠোই দে উয়াকে।

—না, এখন দেখা হবে না। যা।

পানটু টাকাগুলা খান্‌সামার হাতের ভিতর গুঁজিয়া দিয়া বলিল, লে। তুর সায়েবকে দিস্। বলিস্—ফিরে দিঁয়ে গেইছে। বলিয়াই পানটু চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় দরজা খুলিয়া সাহেব বাহিরে আসিলেন। কহিলেন, কোন্ হায়?

চিন্তায় ও উত্তেজনায় সে-রাত্রে তাহার ঘুম হয় নাই। বলিলেন, কে, পানটু? কি হলো?

পান্টু তখনও বেশী দূরে যায় নাই। বলিল, ওই লে সাহেব, তুর্ টাকা লে। আমরা লিব নাই।

সাহেব তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া পান্টুর হাতখানা চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন, আরও চাই, লয়?...আচ্ছা, আরও পঞ্চাশ টাকা দিছি, নিয়ে যা।

পানটু জোর করিয়া হাতটা তাহার ছাড়াইয়া লইয়া চলিতে চলিতে বলিল, না, না, সাহেব, তুর্ টাকা চাইনা আমরা।

স্পর্দ্ধা দেখিয়া সাহেব হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রাগে ফুলিতে লাগিলেন। আর-একবার আগাইয়া গিয়া এই অসভ্য বর্ব্বর কুলিটাকে অনুরোধ করিতেও তাঁহার আত্মসম্মানে বাজিল।

পরদিন প্রাতে খাদ-সরকারবাবুকে সঙ্গে লইয়া দুইজন 'সি-পি'* সর্দ্দার আসিয়া সাহেবকে সংবাদ দিল যে, সাঁওতাল কুলিদের মধ্যে কেহই আজ খাদে নামিবে না। তাহারা একে একে অন্য কুঠিতে পলাইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিতেছে।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন?

তাহারা বলিল, পান্টু আর পাণি তাদিকে ভাঙ্গাই দিছে।

সাহেব একজন চাপ্‌রাশীকে ডাকিবার হুকুম দিলেন।

চাপরাশী আসিলে সাহেব বলিলেন, তোম্‌লোক্ যেৎনা আদ্‌মী আছে সব লোক মিল্‌কে ওহি দুনো আদ্‌মীকো পাকড়্ লে আও!

—কোন্ কোন্ আদ্‌মী হুজুর?

---

* সি-পি সর্দ্দার—Central Provinceএর লোক

—ওহি পান্টু আউর্ পাণি।

চাপ্রাশীরা সকলে মিলিয়া বেলা প্রায় দশটার সময় পান্টু ও পাণিকে ধরিয়া আনিল।

সাহেব প্রথমে তাহাদের দু'জনকে দুইটা খুঁটিতে বেশ করিয়া বাঁধিতে বলিয়া চাবুক লাগাইলেন। কিছুক্ষণ প্রহারের পর খানসামাদের দুই. ঘর খুলিয়া দিয়া, দু'জনকে দুইটা পৃথক্ পৃথক্ ঘরে তালা-বন্ধ করিয়া বলিলেন, ঠিক হ্যায়্।

পাঁচ ছয় দিন পার হইয়া গেল, তথাপি সাহেব কাহাকেও সেদিকে যাইতে দিলেন না। একজন চাপরাশী দিবারাত্রি তাহাদের পাহারায় নিযুক্ত থাকিল,—কেহ যেন কোনও খাবার জনিস, এমন কি, জলটুকু পর্য্যন্ত না দেয়।

বৃদ্ধ সুখন প্রত্যহই সাহেবের কাছে আসিয়া অনুনয়-বিনয় করিত কিন্তু তাঁহার প্রাণে দয়া হইল না। বুড়া বলিত, আমরা যে না খেতে পেয়ে মলম্ সাহেব...তুয় কি ছেলে-পুলে নাই? তুঁই কি ছেলের বেদনা জানিস্ না?

সাহেব বলিতেন, তোমার ছেলে 'এনার্কিষ্ট' আছে। উয়াকে গুলি করে মার্‌তে হয়। আর হামি জানি, সি-পি সর্দ্দার তুদিকে খেতে দ্যায়।

পান্টু ও পাণি যে দুইটা ঘরে আবদ্ধ ছিল, তাহাদের মধ্যে মাত্র একটা দেওয়ালের ব্যবধান। ব্যবধান থাকিলেও, গরাদে-দেওয়া একটা বড় জানালা মেঝের উপর হইতে দেওয়ালের অর্দ্ধেকটা পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছিল। তাহারা পরস্পরকে দেখিতে পাইত, কথা কহিতে পারিত,

গরাদের ফাঁক দিয়া হাতে-হাতে ধরিবারও সুযোগ ছিল।

এই বন্দীশালার ছাদটা ছিল টালির তৈরী। জ্যৈষ্ঠের খর রৌদ্রে টালিগুলা যত বেশি আগুনের মত গরম হইয়া উঠিত, পাণি ও পানটু ক্ষুধায় ও পিপাসায় তত বেশি কাতর হইয়া পড়িত। কিন্তু কোথাও এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত পাইবার উপায় নাই!

সাহেব সেদিন নিজে একবার দেখিতে আসিলেন, অবস্থা তাহাদের সত্যই শোচনীয়। ভাবিলেন, এইবার জব্দ হইয়াছে। বলিলেন, নিশির কথা পুলিশকে যদি না বলিস্ ত' তোদের ছেড়ে দিই।

পানটুর মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছিল না। তবু সে অতি কষ্টে বলিল, 'বলব।'

'আর তুই?' বলিয়া সাহেব একবার পাণির দিকে তাকাইলেন।

পাণিও ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আমিও বলব।

সাহেব দেখিলেন, তেজ তাহাদের তখনও কমে নাই। আরও দিন-কতক্ যাক্, ভাবিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

যতক্ষণ শক্তি ছিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত পাণি ক্ষীণ-কণ্ঠে ডাকিত, পানটু!

পানটু ডাকিত, পাণি!

ছয়দিন নিরম্বু উপবাসের পর তাহাদের মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছিল না। শুষ্ককণ্ঠে ঢোঁক গিলিতে গিয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহাদের মনে হইতেছিল,—এই বুঝি শেষ!

মুখে কথা নাই,—নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে গরাদের গায়ে হেলান্ দিয়া পানটু ও পাণি পরস্পরের পানে কাতর দৃষ্টিতে তাকাইয়া! দুই জোড়া চোখের অপলক দৃষ্টি! উভয়ে উভয়ের মৃত্যু প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। তাহাদের স্তিমিত নয়নের খর দৃষ্টির ভিতর লুপ্তপ্রায় প্রাণটুকু মাত্র সজীব অবস্থায় ধুক্ ধুক্ করিতেছিল। কে যে কখন্ মাটির উপর লুটাইয়া পড়ে, শুধু চোখের দৃষ্টি দিয়া তাহাই দেখিবে!

সাতদিন পরে, সাহেব দয়া করিয়া আবার আসিলেন, ভাবিয়াছিলেন, এবার তাহারা প্রাণের দায়ে ঠিক কুকুরের মত বশ্যতা স্বীকার করিবে, কিন্তু দরজাটা খুলিয়া দেখিলেন, জানালার দুইপাশে দুই জনা, একান্ত কাছাকাছি বসিয়া আছে। পাণির মাথাটা মেঝের উপর লুটাইতেছে। মাত্র একখানা হাত, গরাদের ফাঁকে পানটুর গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। পানটু তাহারই অপর পার্শ্বে শিকের গায়ে হেলান্ দিয়া মুখ গুঁজিয়া বসিয়াছিল। সে তখনও বাঁচিয়া আছে ভাবিয়া, সাহেব বুট্ জুতার ঠোক্কর মারিয়া তাহাকে ডাকিলেন,—ইউ ব্লাডি!

ধাক্কা খাইয়া পানটুর মৃত দেহটা মাটিতে গড়াইয়া পড়িল।

মরণ-বরণ

কি একটা পর্ব্ব উপলক্ষে সেদিন শীতের সন্ধ্যায় কয়লা-কুঠির সমস্ত সাঁওতাল পুরুষ-রমণী, পাঁচ নম্বর কুলি-ধাওড়ার অনতিদূরে একটা প্রান্তরের উপর সমবেত হইয়াছিল। সম্মুখে একটা বহু পুরাতন নীল-কুঠির জীর্ণ ভগ্নাবশেষ—ধনী ও শ্রমিকের বহু অত্যাচার নির্য্যাতনের অতীত সাক্ষ্যরূপে এখনও দাঁড়াইয়া আছে। চারিদিকে বোয়ান্ গাছের জঙ্গল এবং তাহারই পাশ দিয়া শীর্ণকায়া একটি ক্ষুদ্র নদী, তাহার শুষ্কপ্রায় শুভ্র বালুরাশির উপর একটুখানি নির্ম্মল জলপ্রবাহ লইয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া পলাশবনের ভিতর দিয়া ঝির্ ঝির্ করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। শীত-শিহরণ-কম্পিত গাছের পাতায় এবং নদীর জলে বিদায়-রবির রক্তবর্ণচ্ছটা ঝিল্‌মিল্ করিতেছিল।

রবিবার। কয়লা-কুঠির কাজ বন্ধ। কাজেই আজ সমস্ত দিনের বেলাটা কুঠির সাঁওতাল কুলি-কামিনেরা এই নির্জ্জন স্থানে আসিয়া মদ খাইয়া, মাদল বাজাইয়া, গান গাহিয়া তাহাদের আনন্দ-উৎসব বেশ জমাইয়া তুলিয়াছে। সমস্ত দিনের পর, পক্ষী-কলরব-মুখরিত পাণ্ডুর

সায়াহ্নবেলায় তাহারা একে-একে দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া ধাওড়ায় ফিরিবার জন্য বিদায় গ্রহণ করিতেছিল ; সর্ব্বশেষে দেখা গেল, ধীরে-ধীরে যখন প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছে, বৃদ্ধ ভাটুল্ মাঝি রক্তরাগ-রঞ্জিত পশ্চিম গগনের পানে তাকাইয়া করজোড়ে তাহার শেষ ভিক্ষা জানাইল, আমার মরণ দে ঠাকুর, এ বুড়ার আর বাঁচবার সাধ নাই !

কিন্তু দেবতার উদ্দেশে বৃদ্ধের এই কাতর মিনতি এত বেশি স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান এক সাঁওতাল-যুবক কথাটা শুনিতে পাইয়া একটুখানি বিদ্রুপের হাসি হাসিয়া কহিল, মর্‌বি কেনে মাঝি ? তুয়্ মতন হ'লে আমি ত এই বুড়া বয়েসেও মর্‌তে চাইথম্ নাই।

একটুখানি চমকিয়া পিছন ফিরিয়া ভাটুল্ বলিল, কে ? পল্‌হান্ নাকি ?—ও। বলিয়া নদীর কিনারে ঘাসের উপর পায়ে-চলা সঙ্কীর্ণ পথ-রেখা ধরিয়া তাহারা চলিতে লাগিল।

বৃদ্ধের এই গোপন নিবেদন হঠাৎ এমন করিয়া অন্যের গোচরীভূত হইবে জানিলে সে হয়ত পূর্ব্বে সতর্ক হইতে পারিত, কিন্তু ধরা পড়িয়া ভাটুলের সমস্ত মুখখানা সন্ধ্যা-ছায়া-ঘন আকাশের মত বেদনায় পাণ্ডুর হইয়া উঠিল। হয়ত পল্‌হানের কথাটাই ঠিক ! হয়ত তাহার মত খাইবার এবং পরিবার ভাবনা না থাকিলে শ্রমক্লান্ত বৃদ্ধ শ্রমজীবীও খেয়া-পারের ডাক উপেক্ষা করিয়া মরণের পরিবর্ত্তে জীবনের ভিক্ষাই মাগে। কিন্তু তাহার বিক্ষুব্ধ অন্তঃকরণ কেন যে আজ বেদনায় আর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, কেন যে আজ তাহার জীবন-ভার তাহার নিজের কাছেই এত বেশি দুর্ব্বহ, তাহার ইতিহাস জানিলে হয়ত এ বিদ্রুপের ইঙ্গিত পল্‌হানের মুখ দিয়া বাহির হইত না।

ভাটুল্ ধীরে-ধীরে কহিল, হঁ, তা বেটে পল্‌হান্। কিন্তুক্—বলিয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া একটা ঢোঁক্ গিলিয়া বোধকরি একটা প্রচণ্ড ধাকা সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল,—ধর্, তুর্ ঘরেও যদি মোটা ভাত-কাপড়ের ভাবনা না থাকে, আর ইদিকে তুঁই যাকে ভালবাসিস্ সে যদি তুখে ভাল না বাসে,—তখন্?

বৃদ্ধের মুখে এই ভালবাসাবাসির কথাটা নিতান্ত অশোভন শুনাইল বলিয়া পল্‌হান্ ঈষৎ হাসিয়া কহিল, ই বুড়া-বয়েসে তুঁই আবার ভাল-বাস্‌লি কাখে ভাটুল্?

ভাটুল্ তেম্‌নি গম্ভীরভাবে বলিল, ধর্, তুর বৌ যদি বলে, তুখে ছেড়ে পালাঁই যাব; যদি দিনরাত বলে, তুর ঘর করব নাই?

পল্‌হান আবার একটুখানি হাসিয়া বলিল, কেনে, তুর রুকি তাই বল্‌ছে নাকি?

ভাটুল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, উয়ার কথা আর বলিস না ভাই,—উয়ার নাম আর করিস্ না আমার কাছে।

—বুড়া বয়েসে তবে বিয়া কেনে করতে গেলি?

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধ কহিল, তুরাই তখুন বল্‌লি পল্‌হান, —বুড়া বয়েসে যদি একটো ছেলে—

—কেনে ছেলে ত তুর হঁইছে। বলিয়া পলহান্ একবার তাহার মুখের পানে তাকাইল।

উদ্গত বাষ্পোচ্ছ্বাসে ভাটুলের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল, সে তাহা প্রাণপণে ঠেলিয়া দিয়া কহিল, হঁ, হঁইছে।

—তা আমি জানি ভাটুল, সবই জানি। কি করবি, উসব কপাল।

—দেখিস্, এইখানে একটো খাল্ আছে। বলিয়া পল্হান্ তাহাকে অন্ধকারে সতর্ক করিয়া দিয়া ডিঙাইয়া খালের ওপারে গিয়া দাঁড়াইল।

ভাটুল্ এক লাফে খাল পার হইয়া অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে তাহার একখানা হাত সজোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, বল্ পল্হান্, তুখে বলতেই হবেক্—তুঁই কি জানিস্ বল্!

পল্হান তাহার মুখের পানে তাকাইয়া সন্ধ্যার এই আব্ছা-অন্ধকারেও বুঝিল, সে কাঁদিতেছে। বলিল, চুপ কর ভাটুল্। অমন ক'রে তুঁই যে ক্ষেপে যাবি। কাঁদছিস্ কেনে?

ভাটুলের মুখ দিয়া আর একটি কথাও বাহির হইল না।

উভয়ে নীরবে চলিতে চলিতে অনেকখানা পথ অতিক্রম করিল। পাকা-ধানের ক্ষেতের মধ্য দিয়া সরু আলি-রাস্তা ছাড়িয়া তাহারা একটা উঁচু জায়গায় আসিয়া পড়িল। অনতিদূরে তাহাদের ধাওড়াঘর দেখা যাইতেছে। সম্মুখে শুঁড়িখানায় মাতালদের চীৎকার এবং বাক-বিতণ্ডা বড় বেশি উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। নিকটবর্ত্তী অন্যান্য কয়লাকুঠির আলোগুলি এতক্ষণে তাহাদের নজরে পড়িল। আকাশের কোণে সরু ফালির মত একখণ্ড চাঁদের আলোয় এতক্ষণে অন্ধকারের ঘোর কাটিয়া চারিদিকের ঘর-বাড়ী এবং গাছ-পালাগুলি চোখের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠিল; কিন্তু বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া ভাটুলের বুকের অন্ধকার ক্রমশঃ যেন আরও বেশি জমাট্ ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল।

দিন-মজুর

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে গিয়া ভাটুল দেখিল, বাহির হইতে শিকল টানিয়া দিয়া রুকি কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে। বিতৃষ্ণায় তাহার সমস্ত মন ভরিয়া গেল। যে-আগুন তাহার অন্তরের মধ্যে অহোরাত্র জ্বলিতেছে তাহাই যেন আর-একবার দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ধীরে-ধীরে দরজা খুলিয়া অপরিসর উঠানটা পার হইয়া গিয়া, ঘরের চালার একটা খুঁটিতে ঠেস্‌ দিয়া মাতালের মত হাত-পা ছড়াইয়া সে বসিয়া পড়িল।

কুঠির অন্যান্য কুলি-মজুরদের তুলনায় ভাটুলের অবস্থা একটুখানি উন্নত। তাহাদের সংস্কার-হীন জীর্ণ কুটীরের সর্ব্বাঙ্গে যেমন দুঃখ-দৈন্যের সমস্ত চিহ্নগুলি পরিস্ফুট হইয়া বিরাজ করে, ভাটুলের এ-ঘরখানির চারিদিকে তেমন দৈন্যের হতশ্রী প্রকটিত হইয়া দাঁত বাহির করিয়া তাহাকে বিদ্রুপ করে না। করে না বলিয়াই ত আজ তাহার এ লাঞ্ছনা! ভাটুল মনে মনে তাহার গতদিনের সুখৈশ্বর্য্যের কথা ভাবিতে লাগিল।

পিতৃমাতৃহীন ভাটুল যখন তাহার জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া এখানকার এই কয়লা-কুঠিতে প্রথম আসিয়া বারুদ দিয়া খাদের নীচে 'ব্লাষ্টিং'এর কাজ শিখিতে আরম্ভ করে, তখন সে বালক মাত্র। তাহার পর যৌবনে সে বিবাহ করে। একে একে ছয়টি সন্তানের পিতা হইয়া

সে পুরাদস্তুর সংসারী হইয়া উঠে। অতিকষ্টে তাহারা দুই স্ত্রী-পুরুষে ছেলেগুলিকে মানুষ করিয়া তুলিলে পর, ছয়টা জোয়ান ছেলের হাতে ছয়খানা গাঁইতি যখন খাদের নীচে চলিতে থাকে, তখন তাহাদের সুখসৌভাগ্যের আর অন্ত নাই! তাহাদের উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়া এবং সকলের সমবেত শক্তি দিয়া ভাটুল তখন বিঘাকতক জমির চাষ আরম্ভ করিল। ভবিষ্যতের সংস্থানের জন্য কোম্পানীর জীর্ণ কুটীরখানি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া এই ঘরে তাহারা সকলে মিলিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল। তাহার পর নিমেষেই যে একদিন সমস্ত ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে, তাহা কে জানিত! প্রথমে তাহার স্ত্রী মারা গেল। পরে, একদা এক দুর্যোগের রাত্রে, কোন্ এক দৈব-দুর্ঘটনায় পাতালপুরীর অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে তাহার ছয়টি ছেলেই একসঙ্গে সমাধিস্থ হইয়া রহিল। অর্থের লোভে সেই যে এক বাদল-ঘন আষাঢ়-সন্ধ্যায় তাহারা ছয়টি ভাই কোন্ এক বিপদজনক স্থানে কাজ করিবার জন্য খাদের সেই পাতাল-গহ্বরে নামিয়া গেল, পরদিন প্রত্যূষে আর উঠিয়া আসিল না। সেদিনের কথা মনে করিতে গেলে বৃদ্ধের এক একটি পঞ্জরাস্থি খসিয়া পড়ে। বাঁচিয়া থাকিল সে শুধু নিজে। ঐশ্বর্য্যটুকু পশ্চাতে পড়িয়া রহিল বটে, কিন্তু তাহার জীবনের সমস্ত সুখ, সমস্ত আনন্দ, কোন্ পিশাচ তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া ধার-করা জিনিষের মত কাড়িয়া লইয়া গেল। তাই নাকি বিধাতার নিয়ম। বলিবার কিছুই নাই।

কিন্তু মানুষের বুঝি ইহাতেও নিস্তার নাই! এই বিপর্য্যয়ের পর দুইটা

বৎসর পার হইতে না হইতে এই পলিত-কেশ বৃদ্ধের মস্তকে আবার এক নূতন খেয়াল চাপিয়া বসিল। বিবাহ করিয়া সে ত আবার সংসারী হইতে পারে! যদি বুড়া বয়সে একটা ছেলেও রাখিয়া যায় তাহা হইলে তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি ভোগ করিবে!

হইলও তাহাই!

বিবাহ-যোগ্যা কন্যাও মিলিল এবং রূপ-যৌবন-সম্পন্না রুকিকে ভাটুলের হাতে সমর্পণ করিয়া তাহার প্রতিপালক ভ্রাতাও নিশ্চিন্ত হইল, কিন্তু আকণ্ঠ দারুণ পিপাসা লইয়া রুকি এই মরুভূ-বক্ষে হাহাকার করিয়া ফিরিতে লাগিল।

এই দুষ্কর্ম্মের অনিবার্য্য নিষ্ঠুর পরিণাম যে এত ভীষণ তাহা সে পূর্ব্বে কল্পনাও করিতে পারে নাই। এই বেদনা-দুর্ভোগ, এই পরিহাসের লজ্জা যে তাহাকে মাথায় করিয়া আমরণ বহিতে হইবে, সে-কথা ভাটুল যদি আগে টের পাইত তাহা হইলে কখনই এ তিক্ত বিষ পান করিয়া আজ তাহাকে ছটফট করিয়া মরিতে হইত না!

হঠাৎ তাহার চিন্তার গতি প্রতিহত হইয়া গেল। সম্মুখে প্রাঙ্গনের উপর কাহার পদশব্দে সচকিত হইয়া তাকাইয়া দেখিল, রুকি তাহার চার বৎসরের সন্তান ফাগুকে কোলে লইয়া তাহারই দিকে অগ্রসর হইতেছে।

উঠানের উপর ছেলেটাকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া রুকি বলিল, হা ত্থাখ্, তুর বাবার কাছকে যা—আমি চট করে' ভাত রেঁধে লি।

রুকি লণ্ঠন জ্বালিবার জন্য ঘরের ভিতর গিয়া ঢুকিল, ফাগু ভাটুলের গায়ের উপর 'বাবা' বলিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল।

যে-ছেলেটার কচি বাহুর আবেষ্টনীর মধ্যে ভাটুল এতদিন না জানিয়া

নিজেকে ধরা দিয়াছিল, আজ তাহার স্পর্শে ভাটুলের সর্ব্বাঙ্গে বহ্নিজ্বালা সুরু হইল। প্রথম-প্রথম ভাটুলের সন্তান-পিয়াসী হৃদয় অপরিসীম আনন্দে বিভোর হইয়া অতীতের জ্বালাময়ী স্মৃতিটুকু নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিত; ফাগুর মত এমন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর গৌরকান্তি সন্তান কালো সাঁওতালের ঘরে জন্মে না বলিয়াই হয়ত ভাটুল তাহার পিতৃত্বের গৌরবে গত-জীবনের সর্ব্বনাশা ইতিহাস ভুলিয়াছিল; কিন্তু ঠিক এমনি সময়েই একটা বড় কঠোর সত্য জন-প্রবাদ তাহার কানে আসিয়া তীরের মত বিঁধিল! সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত পৃথিবীটা যেন তাহার চোখের সম্মুখে ওলট-পালট হইয়া গেল। এই নধরকান্তি প্রিয়দর্শন সন্তানের সর্ব্বাঙ্গ ঘেরিয়া যে গৌরাঙ্গ পিতার প্রতিচ্ছবি—তাহারই চোখের সুমুখে, তাহারই বুকের উপর তাহারই অন্নে পরিপুষ্ট হইয়া প্রতিদিন স্পষ্টতর হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে, সে বস্তুটা এতদিন তাহার নজরে পড়ে নাই, এইবার তাহা যেন সে লক্ষ্য করিতে লাগিল। গৌরব যে এমন করিয়া কোনোদিন কলঙ্কের মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিবে, এই স্নেহান্ধ মূঢ় সে কথা কোনদিন বিশ্বাস করিত না!

ভাটুলের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ফাগু ডাকিল, বাবা!

হাত দিয়া জোর করিয়া ফাগুকে সরাইয়া দিয়া ভাটুল তীব্রকণ্ঠে কহিল, রুকি!

রুকি তখন লণ্ঠনটা অদূরে নামাইয়া রাখিয়া উঠানের এক প্রান্তে উনান ধরাইতেছিল, স্বামীর এই কঠোর কণ্ঠস্বরে সহসা চমকিত হইয়া ফিরিয়া তাকাইল। কিন্তু বৃদ্ধের ঐ কোটর-প্রবিষ্ট দুইটা জ্বলন্ত চক্ষুর ভিতর হইতে যে এমন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মত বিদ্যুৎ-জ্বালা নির্গত হইতে

পারে, তাহা সে কোনদিন জানিত না, হঠাৎ থতমত খাইয়া বলিয়া উঠিল, কি !

ফাগুর একখানা হাত তাহার দৃঢ় মুষ্টির মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ভাটুল চীৎকার করিয়া কহিল, আজ তুঁই বল্ রুকি, ই ছেলে কার ?

অত্যন্ত সহজ-কণ্ঠে রুকি বলিল, ও মা, তুঁই ক্ষেপ্‌লি নাকি ? উ আবার কি-কথা ? বলিয়া তাড়াতাড়ি ফাগুর কাছে অগ্রসর হইয়া ফাগুর আর একখানা হাত ধরিয়া নিজের দিকে টানিয়া আনিয়া বলিল, ছাড়্, ছাড়্, উয়ার হাতটো যে গেল !

ফাগুকে ছাড়িয়া দিয়া এইবার রুকির অঞ্চলপ্রান্ত চাপিয়া ধরিয়া ভাটুল পূর্ব্বাপেক্ষা মৃদুস্বরে কহিল, তুর পায়ে পড়ি রুকি তুঁই বল্—তুখে কিছুই বলব নাই। আমি সব জানি,—সব শুনেছি।

ফাগুকে কোলে তুলিয়া লইয়া রুকি হাসিতে হাসিতে বলিল, আ-মর ! কি বলব কি ?

মায়াবিনী তরুণীর এই মুখের হাসি যেন জগতের জাগ্রত মিথ্যাকে সত্যের মুখোস পরাইতে জানে ! রুকির এই হাস্যোজ্জ্বল মুখের পানে তাকাইয়া সহসা বৃদ্ধের ভ্রম হইল, জনশ্রুতি মিথ্যা নয় ত !

পরক্ষণেই আবার ফাগুর মুখের পানে তাকাইয়া ভাটুলের সে চোখের ঘোর কাটিয়া গেল, বলিল,—বল্‌বি নাই ? তাহেলে দেখাব মজা !

—কি মজা দেখাবি তুঁই ? দিন-রাত ডর ডসাছিস্ যে ! বলিয়া ছেলেটাকে কোলে লইয়াই রুকি উনানের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

ভাটুল বলিল, জমি-জায়গা আমার যা আছে, আর-কাহুকে দিঁয়ে দিব। খাদে খাট্‌বি আর খাবি তখন !

এ আশঙ্কা সত্যই সে কোনোদিন করে নাই। হয়ত হইতেও পারে! বলিল,—মাইরি আর-কি! দিস্ দেখি? ভারি মরদ রে তুঁই?

—দেখবি, কাল যদি না দিই ত' আমার নাম ভাটুল মাঝি লয়!

—তবে দিস্। এই আমিও চল্লুম, খা তুঁই কেমন করে' খাবি। বলিয়া রুকি সরোষে ভাতের হাঁড়িটা উঠানের মাঝখানে ফুটাইয়া দিয়া ফাগুকে কোলে তুলিয়া হন্ হন্ করিয়া বাহিরের দিকে চলিয়া যাইতেছিল।

ভাটুল চীৎকার করিয়া বলিল, আর আসিস্ না হারামজাদী, সায়েবের কাছকে যেছিস্ ত? সায়েব তুর—

শেষের কথাটা অসমাপ্তই রহিয়া গেল। বাহির হইতে রুকির কথা-গুলা তীক্ষ্ণ বাণের মত ভাটুলের বুকে আসিয়া বাজিল—সে বলিতেছে,—তুর মুরদ কত থাল্‌ভরা! বেশ করব, তুর কি!

দিনকতক পরে, একদিন সত্য-সত্যই রাণীগঞ্জ হইতে ভাটুল একখানা দানপত্র দলিলের কাগজ কিনিয়া আনিল। পাঁচটি টাকা লইয়া কুঠির এক বাবু, পল্‌হানের নামে ভাটুলের জমি-জায়গার একটা দানপত্র লিখিয়া দিবে বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। সেদিন মধ্যাহ্নে বাবুদের মেসের একটা ঘরে বসিয়া বাবু লিখিতেছিল, ভাটুল তাহার পাঁচ বিঘা জমি এবং ঘরবাড়ীর চৌহদ্দী বলিয়া দিতেছিল এবং অনতিদূরে হেঁটমুখে মৌন হইয়া পল্‌হান্ বিবেচনা করিতেছিল—কাজটা তাহার ভাল হইতেছে কি-না।

এমন সময় অকস্মাৎ কুঠির ম্যানেজার-সাহেবকে সেখানে প্রবেশ করিতে দেখিয়া এই তিনটি প্রাণী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সর্ব্ব প্রথমে বাবুর হাত হইতে কাগজটা কাড়িয়া লইয়া সাহেব কুটি-কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং হস্তধৃত বেত্রদণ্ডটা বৃদ্ধ ভাটুলের প্রতি ব্যবহার করিতে গিয়া সহসা থামিয়া গেল। ভাটুল বহুদিনের পুরাতন লোক এবং তাহার প্রতি এ ব্যবহার যুক্তিযুক্ত নয় ভাবিয়া সাহেব বলিল, ই টোমারা কি রকম কাম্ আছে ভাটুল। ইহা উচিট্ নহে। যাও।

সাহেব চলিয়া যাইতেছিল, বাহিরে ফাগুকে লইয়া দণ্ডায়মান রুকিকে দেখিয়া পুনরায় কহিল, ফের্ যডি এ-রকমটি করবে টো হামি ছোড়বে না। টুমি শালার হাড় গুঁড়া করিয়া ডিবে।

সাহেবের জুতার শব্দ বাহিরে মিলাইয়া গেল। ভাটুল নীরবে কিয়ৎ-কাল বসিয়া থাকিয়া ধীরে-ধীরে উঠিল। রুকি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ভাটুল পল্‌হানকে ডাকিল, আয় পল্‌হান্!

তাহাদের ষড়যন্ত্র যে এমন ভাবে ব্যর্থ হইয়া যাইবে তাহা কেহই জানিত না।

সেদিন অপরাহ্ণে ভাটুল সন্ধান লইয়া জানিল, ফাগুকে সাহেবের খান্‌সামার কাছে রাখিয়া রুকি ও সাহেব উভয়েই খাদের নীচে নামিয়া

গেছে। এমন বোধ হয় তাহারা প্রত্যহই যায়, কারণ ব্যাভিচারের এমন নিভৃত নিরাপদ স্থান আর কোথাও নাই!

কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া ভাটুল সেদিন তাহার চুরি-করা ডিনামাইট বারুদ ও কেরোসিনের একটা মগ্ বাতি লইয়া খাদের নীচে নামিয়া গেল, শুনিল, সাহেব তখনও নামে নাই, তবে, রুকি নামিয়া বোধকরি তেইশ-নম্বর গ্যালারীর দিকে খাটিতে গিয়াছে।

ভাটুলও তাহার পরিচিত একজন সি-পি সর্দ্দারের কাছে একটা লোহার 'সাবল' চাহিয়া লইয়া তেইশ নম্বরের দিকে চলিয়া গেল।

অনেক অনুসন্ধানের পর তাহারই কিছুদূরে একটা নির্জ্জন জায়গায় 'পিলারের' গায়ে 'সাবল্' দিয়া সোজা খানিকটা গর্ত্ত খুঁড়িল এবং তাহার ভিতর ডিনামাইট্ ও বারুদের পলিতা দিয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

ভাটুল তেইশ নম্বর গ্যালারির কাছে গিয়া দেখিল, অন্যান্য কুলি-কামিনদের সহিত রুকি রঙ্গ-রহস্যে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

প্রজ্জ্বলিত মগ-বাতিটা হাতে লইয়া হাসিতে হাসিতে ভাটুল ডাকিল, রুকি!

ভাটুলের মুখে হাসি দেখিয়া সেও সহাস্যে তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল। বলিল, কি বল্‌ছিস্? তুঁই কিস্‌কে এসেছিলি;

মুখে আবার একটুখানি শুষ্ক হাসি টানিয়া আনিয়া ভাটুল বলিল, তুয়্ ত কিছু কাজ নাই,—আয় কেনে।

চল, বলিয়া উভয়ে পাশাপাশি চলিতে লাগিল।

পূর্ব্ব-পরিত্যক্ত সেই 'পিলারটার' কাছে আসিয়া ভাটুল বলিল, আর যাস্ না, দাঁড়া। শুন্ রুকি, তুখে একটি কথা বল্‌বার জন্যে ডেকেছি।

—কি কথা? বলিয়া রুকি ফিরিয়া দাঁড়াইল।

হাত দিয়া রুকির গলাটা বেশ করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া ভাটুল কহিল, তুঁই আমাকে ভালোবাসিস্ রুকি? বল্, একবারটি রা কেড়ে বল্—ইথানে ত কেউ নাই!

ভাটুলের এ অদ্ভুত কণ্ঠস্বর রুকি কোনদিন শুনিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। রুকি তাহার মুখের পানে তাকাইয়া কি উত্তর দিবে তাহাই ভাবিতেছিল। মগ-বাতির আলোয় সামান্য একটুখানি স্থান আলোকিত হইয়াছে মাত্র, তদ্ভিন্ন উপরে, নীচে, পার্শ্বে, সুড়ঙ্গের ভিতর যতদূর দৃষ্টি চলে—গাঢ় অন্ধকার!

ভাটুল এইবার রুকিকে আর-একটুখানি জোরে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিল, বুড়ার মুখে ই-কথাটি শুনে হাঁসিস্ না। তুখে আমি বড় ভালবেসেছি, কিন্তুক্ তুঁই আমাকে বাসিস্ নাই। তুঁই বড় নিমখারাম। আচ্ছা, বল্ ত রুকি, আমরা দুজনায় যদি এইখানে এক সঙ্গে মরি!—লে ধর্—আমাকে ভাল ক'রে জড়াঁই ধর্—এমনি ক'রে, আরও জোরে। ছাড়িস্ না! বলিয়া এক হাত দিয়া রুকিকে সজোরে চাপিয়া ধরিয়া অন্য হাতে জ্বলন্ত মগ-বাতিটা তুলিয়া, ভাটুল 'পিলারের' গায়ে বারুদের পলিতায় আগুন ধরাইয়া দিল। রুকি এতক্ষণে প্রাণের ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, অ্যাঁ, ই-কি! তুঁই আমাকে মার্বি না কি?

দাঁতে দাঁত চাপিয়া বজ্র-গম্ভীর কণ্ঠে ভাটুল আর্তনাদ করিয়া উঠিল, হুঁ,—খুন করব। নিজেও মরব।—দাঁড়া, নড়িস্ না! আর একটুকু। আওয়াজ হোলো বলে'—!

প্রাণপণে নিজেকে তাহার কঠোর বাহুপাশ হইতে মুক্ত করিবার

চেষ্টা করিয়া মিনতি-কাতর কম্পিত কণ্ঠে রুকি বলিল, তুয় পায়ে পড়ি ভাটুল,—আমার ফাগু! ফাগু!

সন্তান-বিচ্ছেদ-ব্যথিতা জননীর আর্ত্তনাদ! পুত্রের বেদনা ভাটুল বেশ ভাল করিয়াই জানে। নিমেষেই ভাটুল যেন একটুখানি অন্যমনস্ক হইয়া গেল। নিজের দুই বাহুর অবেষ্টন শিথিল করিয়া দিয়া বলিল,—যা!

রুকি প্রাণপণে কিয়দ্দুর সরিয়া গিয়া বলিল, আর তুঁই?

চির-বিদায়ের মুহূর্ত্তে ভাটুলের কম্পিত সজলকণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া উঠিল, না, আমি থাকি।

অন্ধকারের মধ্যে প্রাণের ভয়ে রুকি কিয়দ্দুর ছুটিয়া আসিবার পর, পশ্চাতে গাঢ় অন্ধকারের মধ্য হইতে পাতালভেদী এক বিরাট শব্দ তাহার কাণদুটাকে একেবারে যেন বধির করিয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিশ্বাস এবং বুকের শব্দ এত বেশি দ্রুত হইয়া উঠিল যে, প্রতিমুহূর্ত্তেই তাহার মনে হইতে লাগিল, বুঝি-বা তাহারও জীবন এই খানেই শেষ হইয়া যায়!

দিন দশ-বারো পরে, কোম্পানীর অন্য একটা কুঠিতে যাইবার জন্য হেড্-আফিস্ হইতে সাহেবের উপর হুকুম আসিল।

সংবাদ পাইয়া সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে রুকি তাহার ছেলেটাকে কোলে লইয়া সাহেবের বাংলোর দিকে ছুটিতে ছুটিতে গান ধরিল,—

দিন-মজুর

—তোর সঙ্গে কর্‌ব ভাব,
তোর সঙ্গে যাইব হে—
তোখে দিব সরু বেলের মালা !—

সাহেবের জিনিষ-পত্র তখন ষ্টেশনে চলিয়া গিয়াছে। নিজে যাইবার জন্য মোটরের অপেক্ষায় একটা ইজিচেয়ারের উপর বসিয়া সাহেব তখন চুরুট টানিতেছিল।

রুকি বলিল, আমাদের কোথা রেখে যাবি সাহেব—আমরাও যাব।

সাহেবের প্রয়োজনের দিন তখন অতীত হইয়াছে। তাড়াতাড়ি পকেট হইতে দুইটা টাকা বাহির করিয়া রুকির হাতে দিয়া বলিল, ডো রোপিয়া লে। টুহার ফাগুয়াকে রুস্‌গুল্লা খাওয়াস্‌ !

বাহিরে রাস্তার উপর মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। আর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সাহেব তাহাতে উঠিয়া বসিতেই সশব্দে মোটর ছাড়িয়া দিল।

জমিদার দূরে বাস করিতেন, কাজেই তাঁহার জমিদারীর এক প্রান্তে কয়েকখানা ক্ষুদ্র গ্রামে প্রজাশাসন এবং খাজনা আদায় বেশ সুচারুরূপে হইতেছিল না। অধিকন্তু, তৎসংলগ্ন প্রায় ছয়-সাত ক্রোশব্যাপী একটা প্রকাণ্ড শালবনের গাছপালা কাটিয়া-কুটিয়া গ্রামবাসীরাই ভোগ করিতেছিল,—জমিদারের কোন কাজেই লাগিতেছিল না।

না লাগিবারই কথা।

বৎসরের কিস্তি আদায় করিবার জন্য বৎসরে দুইবার জমিদারের যে কর্মচারী মহাশয়ের সেখানে শুভাগমন হইত, তিনি প্রায় সমস্ত লুট করিয়া নিজ বাড়ীতে লইয়া গিয়া জমিদারকে বুঝাইয়া দিতেন, দরিদ্র প্রজাদের কাছ হইতে কোন-কিছু পাইবার প্রত্যাশা করা বৃথা। কিন্তু হুজুর যদি তাহাকে উক্ত তালুকের যে-কোন একটা গ্রামে কাছারি-বাড়ী প্রস্তুত করিয়া নায়েবের মত বাস করিতে হুকুম দেন, তাহা হইলে তিনি অবাধ্য প্রজাগণকে দুরস্ত করিয়া দিতে ত' পারেনই, এমন্-কি, এক বৎসরের মধ্যে

জমিদারীর আয় যদি পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু বাড়াইয়া দিতে না পারেন, তাহা হইলে আজীবন বিনা বেতনে গোলামী করিবেন।

জমিদার হুকুম দিলেন।

ফলতঃ, দরিদ্র প্রজাগণের দণ্ড-মুণ্ডের বিধানকর্ত্তা রূপে নায়েব-মহাশয় জমিদারীতে সপরিবারে পাইক্-পেয়াদা সহ বাস করিতে লাগিলেন ; এবং উৎকট দরিদ্র-পীড়নের যত প্রকার কূট পন্থা তাঁহার জানা ছিল, তৎসমুদায় প্রয়োগ করিয়া এক বৎসরের মধ্যে জমিদারকে খুসী করিয়া ফেলিলেন ; এবং নিজের জন্য যাহা করিলেন, তাহা বলা নিস্প্রয়োজন।

শালবনের কয়েকটা বড়-বড় শাল ও মহুয়া গাছ কাটাইয়া, প্রজাদের গরুর গাড়ীতে বোঝাই দিয়া নায়েব-মহাশয় দেশে পাঠাইতেছিলেন। একদিন এক চাপরাশী আসিয়া সংবাদ দিল,—হুজুর, জঙ্গল্‌কা ইস্‌তরফ্‌ সাঁওতাল লোগন্ সব মোকান্ বনাইসে,—ডাঙ্গা কাট্‌কে জমি তৈয়ার কর্‌ছে,—এত্‌না বড়া-বড়া ধান্‌কা গাছ ভি হুয়া। জঙ্গল্‌সে লক্‌ড়ি ভি কাট্‌তা, শুখা পাতা ভি লিয়ে যাচ্ছে, আউর, হাম্ লোগ ডাক্‌ছে তো বাৎমে ভি পিসাব্ কর্ দিস্‌সে।......

জমিদারীর মধ্যে বাস করিয়া জমিদারের চাপরাশীর হুকুম মানে না, প্রজার এত বড় উদ্ধত প্রতাপ অসহ্য। নায়েব-মহাশয় দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া চীৎকার করিয়া কহিলেন,—তোম্ শালা ছাতুখোর লোক্‌কে তবে কি জন্যে রেখেছি রে হারামজাদা! সব বেটাকে জোর ক'রে ধরে নিয়ে আয় আমার কাছে,—দেখি, কেমন কথা না শোনে।

যো হুকুম হুজুর। বলিয়া চাপরাশী-মহাপ্রভু লাঠি লইয়া বাহির হইয়া গেল। কিন্তু সে জানিত না, যাহাদের সে গায়ের জোরে বাঁধিয়া

আনিতে চলিল, ভারতের সেই আদিম অনার্য্য অধিবাসী হয় ত' মিষ্টি কথার গোলাম হইতে পারে, কিন্তু দুনিয়ার কাহারও চোখ-রাঙানির অনুশাসন মানিয়া চলে না।

শেষ ফল যাহা দাঁড়াইল, তাহা অন্ততঃ প্রবল প্রতাপান্বিত নায়েব মহাশয়ের পক্ষে নিতান্ত অপমানসূচক। প্রায় দশ বারো জন চাপরাশী বড়-বড় লাঠি লইয়া সাঁওতালদের শাসন করিতে গিয়া, প্রথমে তাহাদের দুর্ব্বোধ্য আধা-বাঙলা আধা-হিন্দী ভাষায় যে-সব কথা বলিল, তাহার এক বর্ণও সাঁওতালেরা বুঝিতে না পারিয়া বলিল, কি বল্‌ছিস্ তুরা, আমরা বুঝতে লাচ্ছি।

বুঝ্‌নে নেই সেকেগা তো হাম্‌লোগ কেয়া করেগা, হারামজাদ্! বলিয়া একজন চাপরাশী এক সাঁওতাল-যুবকের কাণে ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া কিয়দ্দুর টানিয়া আনিল। এবং তৎক্ষণাৎ ক্ষমতা-প্রাপ্ত অন্যান্য চাপরাশীদের হস্ত-ধৃত বংশযষ্টিগুলা সমবেত নিরীহ সাঁওতালদের উপর সশব্দে পড়িতে এবং উঠিতে লাগিল।

বিনাদোষে এ অত্যাচার তাহাদের সহ্য হইল না; সম্মুখে যে যাহা পাইল, উঠাইয়া লইয়া, মার্ মার্ শব্দে স্ত্রী-পুরুষ সকলে মিলিয়া, জমিদারের চাপরাশীগুলাকে ভাগাইয়া দিল।

আগুন জ্বলিয়া উঠিল! সংবাদ পাইয়া নায়েব-মহাশয়ের আপাদ-মস্তক রাগে গিস্ গিস্ করিতে লাগিল। কহিলেন,—আজ আমি নিজে সেখানে যাব,—তোরা যাস্ আমার সঙ্গে।

দুই

গোধূলি-ধূসর ম্লান সন্ধ্যায় শীতের বাতাস হিল্‌ হিল্‌ করিয়া বহিতে-ছিল। ঘন-বিন্যস্ত শাল, তমাল ও মহুয়া-বনের বুক চিরিয়া, নাম-না-জানা কত বনফুলের মিষ্ট গন্ধভরা যে সঙ্কীর্ণ বনপথটি আঁকিয়া-বাঁকিয়া অদূরে সাঁওতাল-পল্লীর নিকট গিয়া পৌঁছিয়াছে, সেই পথ ধরিয়া পাইক্‌-পিয়াদা সঙ্গে লইয়া, নায়েব-মহাশয় চলিয়াছেন। কঙ্করময় কঠিন প্রান্তরের উপর সোণালী রঙের পাকা ধানের ক্ষেতগুলি প্রথমেই তাঁহার নজরে পড়িল। গায়ের জোরে যে এমন পাথরের উপরেও সোণার ফসল জন্মিতে পারে, এ ধারণা তাঁহার ছিল না। আরও একটুখানি অগ্রসর হইতেই, সম্মুখে সমুন্নত-শীর্ষ তরুরাজির স্নিগ্ধ-শ্যামল ছায়ায় ঘেরা শান্ত সুন্দর ক্ষুদ্র পল্লীর উপর দৃষ্টি পড়িতেই, এই নৃশংস পাষণ্ডের প্রাণেও হিংসা জাগিল। সুস্থ সবল পুরুষ-রমণীরা মনের আনন্দে এমনি ভাবে কাজ করিতেছিল, যে, দেখিয়া বিশ্বাস হইল না যে, আজিকার মধ্যাহ্নবেলায় ইহাদেরই মাথার উপর একটা প্রবল অত্যাচারের ঝড় বহিয়া গেছে!

পুনরায় সেই অত্যাচারীর দল এক ভদ্রবেশী যুবককে সঙ্গে লইয়া তাহাদেরই কুটীরের দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া সাঁওতালেরা সকলে একটুখানি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

কয়েকটা কুকুর সমস্বরে ঘেউ-ঘেউ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেই, জনৈক বৃদ্ধ সাঁওতাল তাহাদের চুপ করিবার ইঙ্গিত করিয়া, অগ্রসর হইয়া আসিল।

নায়েব জিজ্ঞাসা করিল, তোরা কতদিন আছিস এখানে ?

বৃদ্ধ বলিল,—কেনে,···এনেক্ দিন।

নায়েব বৃদ্ধের দিকে একটা তীক্ষ্ণ কটাক্ষ হানিয়া কহিলেন,—ক' বছর ?

—অত-সব জানি না ত'।···কি করতে এসেছিস্ তুঁই ?

—আমার লোকের কথা শুনিস্ নি কেন ?

বৃদ্ধ রাগিয়া কহিল,—উয়ারা যদি তুর লোক হয়, তাহলে তুকেও মারব। উয়ারা মেরেছে আমাদিকে।···ওরে লখাই, ডোম্‌না !

তাহার ডাক শুনিয়া কয়েকজন সাঁওতাল তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

নায়েব-মহাশয় একটু জোরে বলিলেন, আমি কে জানিস ?

বৃদ্ধ কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় একটা চাপরাশী বলিল,—উনি গাঁয়ের রাজা আছেন, জানিস্ ? হাম্‌রা উনার চাপরাশী আছি।

ডোম্‌না বলিল, আছিস্ ত' আছিস্···আমাদের কি ?

নায়েব কহিলেন,—আমার গাঁয়ে তোদের খাটতে হবে,—জমির খাজনা দিতে হবে।

—ধেৎ, উসব আমরা কখনো করছি নাই,—উসব আমাদের নাই।

একজন চাপরাশী লাঠি লইয়া তাহাদের কাছে আসিয়া বুঝাইয়া বলিল, তাহ'লে এই জায়গাটি ছোড়ি দিতে হবে।

একজন সাঁওতাল কহিল,—কিস্‌কে ? ই-জায়গা কারু লয়। আমরা বনের কাঠের ঘর করেছি,—চাষ করেছি, তুঁই কে বেটিস্ ?···যা বাবু, তুঁই ঘরকে যা।

ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন সাঁওতাল সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। নায়েব-মহাশয় গতিক ভাল বুঝিলেন না। একটু সরিয়া গিয়া চাপরাশী-দের ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, চলে' আয় সব,—এর পর আর-একদিন দেখা যাবে।

প্রতিপদের চাঁদ উঠিতে তখনও একটুখানি দেরী ছিল। চারিদিকের ধূসর আকাশ তখন অন্ধকারে গাঢ় হইয়া আসিয়াছে।

বনের পথে প্রবেশ করিয়া নায়েব দেখিলেন, পশ্চাতে ঘন গাছের সারি ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। পকেটে গুলিভরা পিস্তলটা এক-বার হাত দিয়া দেখিয়া লইলেন।

যে-পথ ধরিয়া তাহারা চলিতেছিল, সেই পথে এক সাঁওতাল-যুবতী মাটির কলসে জল লইয়া গৃহে ফিরিতেছিল। হঠাৎ পথের মাঝে এতগুলা লোক দেখিয়া, এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। সামান্য ঘোলাটে অন্ধকারে মেয়েটাকে বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া গেল। নায়েব তৎক্ষণাৎ চাপরাশীকে হুকুম করিলেন,—লে যাও জল্‌দি।...দেখো, চিল্লায় মাৎ।

আজ্ঞা পাইবামাত্র চাপরাশী দুইজন মাথার পাগড়ি খুলিয়া অতর্কিত-ভাবে রমণীর মুখে চাপিয়া ধরিতেই তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। তাড়াতাড়ি আর-একটা পাগড়ি দিয়া তাহার হাতে পায়ে বাঁধিয়া আর-একজন তাহাকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া নিবিড় বনের পাতার ভিড়ের ভিতর নিমেষের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। অপর একজন যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে তাহার পশ্চাতে চলিল।

অন্যান্য সকলকে লইয়া নায়েব-মহাশয় ধীরে-ধীরে রাস্তা ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। একজন কল্‌সিটা বনের ভিতর ভাঙিয়া দিয়া আসিল।

নায়েব বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন, তাহারা ইতিমধ্যে মেয়েটাকে লইয়া বৈঠকখানায় বন্দিনী অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়াছে এবং হুজুরের অপেক্ষায় দরজায় বসিয়া বসিয়া গল্প করিতেছে।

তিন

বৈঠকখানা বাড়ীতেই মদ আসিল,—পানপাত্র আসিল। নায়েব-মহাশয় একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন লইয়া সেইখানে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই হাতের আলোটা তুলিয়া ধরিয়া মেয়েটার দিকে একবার কটাক্ষপাত করিতেই তিনি চমকিয়া উঠিলেন। সাঁওতাল-যুবতীর ভরা-যৌবনের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ঢল-ঢল কান্তি এবং রূপ-লাবণ্য দেখিয়া এই মদ্যপায়ী পাষণ্ডের চমকিয়া উঠিবারই কথা।

পরিপূর্ণ একটা মদ্যপাত্র গলাধঃকরণ করিয়া, পকেট হইতে গুলিভরা পিস্তলটা বাহির করিলেন। বলিলেন, খবর্‌দার, একটি কথা কইবি কি গুলি করে' ফেল্‌ব। দাঁড়া আমি তোর বাঁধন খুলে দিচ্ছি —বলিয়া হাত মুখের কাপড়টা খুলিয়া ফেলিতেই মেয়েটা কহিল, তুই কেনে আমাকে ধরে' আন্‌লি বাবু?

কেন?—বলিয়া নায়েব মৃদু হাসিয়া তাহাকে ধরিতে গেলেন।

মেয়েটা তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। খানিকটা সরিয়া গিয়া কহিল, খবরদার!

—ইস্, আমার উপর চোখ-রাঙানি বুঝি? বলিয়া, যেমনি তিনি দু' হাত বাড়াইয়া জোর করিয়া তাহাকে ধরিতে যাইবেন, সহসা পশ্চাতে কাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া তিনি চমকিয়া পিছন ফিরিলেন। অন্ধকারে হঠাৎ ভূত দেখিলে মানুষের মুখের চেহারা যেমন হয়, তাঁহারও মুখখানা ঠিক তেমনি হইয়া গেল।

দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

গিন্নীকে ভয় তিনি যথেষ্ট করিতেন। মদের নেশা একটুখানি চটিয়া গেল। নীরবে নত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। হাতের ইসারায় একজন চাপরাশীকে কাছে ডাকিয়া চুপি-চুপি কি যেন বলিয়া দিয়া স্ত্রীর পশ্চাতে তিনিও সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

গিন্নীর কানে কি প্রকারে যে এ-সংবাদ গিয়া পৌঁছিয়াছিল, তাহা ঠাহর করিতে পারিলেন না; একবার ভাবিলেন, জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হইল না।

স্বামীকে একটু তিরস্কার করিয়া স্ত্রী কহিলেন,—লজ্জাও করে না তোমার, ছিঃ!

তাহার পর বাড়ীর ভিতরে গিয়া ঝগড়া-ঝাঁটি কান্নাকাটি কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া বেশ পুরাদমেই চলিল এবং শেষ ফল হইল এই যে, সমস্ত রাত্রির মধ্যে একটি বারের জন্যও নায়েব-মশাই বাহিরে আসিতে পারিলেন না; জেলখানার কয়েদির মত অন্দর-মহলেই আবদ্ধ হইয়া রহিলেন।

পর দিন অতি প্রত্যুষে নায়েব শয্যাত্যাগ করিয়াই দেখিলেন, সাঁওতাল পুরুষ-রমণী বালক-বালিকায় তাঁহার উঠানটা প্রায় ভরিয়া গেছে। তাহাদের প্রত্যেকের হাতে তীর-ধনুক। নায়েবকে দেখিবামাত্র তাহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, আমাদের টেবিকে তুঁই ধরে' এনেছিস,—দে, বার্ করে' দে। তা না হ'লে তুখে বিঁধেই মারুব।

নায়েবের মনে-মনে ভয় হইল। তৎক্ষণাৎ তিনি সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন এবং চাকরটাকে কাছে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিয়া দিলেন, চাপরাশীদের গিয়ে বল্, তারা যেন মেয়েটাকে ছেড়ে দ্যায়।

চাপরাশীদের বলিতে হইল না; মেয়েটা তালা-বন্ধ বৈঠকখানায় বন্ধন-মুক্ত অবস্থাতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সাঁওতালদের গোলমাল শুনিয়া সে নিজেই ভিতর হইতে চীৎকার করিয়া কহিল,—আমি এইখানে আছি।

সকলে মিলিয়া দরজার কবাট দুইটা টানিয়া ছাড়াইয়া টেবিকে উদ্ধার করিল। জমিদারের চাপরাশীদের দেখাইয়া দিয়া টেবি সাঁওতালী ভাষায় তাহার পিতাকে যাহা কহিল, তাহা শুনিয়া সকলে রাগে টলিতে লাগিল এবং কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া তাহাকে লইয়া কাছারি ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

কাহারও মুখে কোনও কথা নাই!

পথে একজন মুরুব্বি-গোছের সাঁওতাল টেবির বাবার কাণে-কাণে কহিল,—তাহ'লেও টেবির কি দণ্ড জানিস্?

কন্যার শাস্তির কথা শুনিয়া, পিতার বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল, কহিল, —জানি।

—উয়ার বেঁচে থাকা আর মরে' যাওয়া দুই-ই সমান। কি আর করবি বল্। উয়াকে মরতেই হবেক্।

টেবির পিতা লখাইয়ের মুখখানি শুকাইয়া গেল। বলিল,—যা করবি কর্—আমাকে আর শুধোস্ না।

সন্ধ্যার পর, টেবিকে বনের একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষে বাঁধা হইল। লখাই এ ভয়াবহ দৃশ্য দেখিতে পারিবে না বলিয়া দূরে সরিয়া গেল।

একজন সাঁওতাল যুবকের উপর বিষাক্ত তীর বিঁধিয়া টেবিকে হত্যা করিবার ভার দেওয়া হইল। যুবক প্রথমে সম্মত হইয়াছিল। কিন্তু ধনুকে তীর লাগাইয়া টেবির মুখের পানে একবার তাকাইয়াই বলিল, না, আমি লার্‌ব। বলিয়া তীর-ধনুক সে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

অবশেষে এক প্রৌঢ় সাঁওতাল নিজে তীর-ধনুক তুলিয়া লইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে টেবির বক্ষের উপর বিষ-বাণ বিদ্ধ করিল। সর্ব্বাঙ্গে বিষের যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে কিছুক্ষণ পরে টেবি গাছের গায়ে লুটাইয়া পড়িল।

সেই দিনই সন্ধ্যায় সকলে মিলিয়া শুক্‌নো গাছ কাটিয়া নিভৃত বনানী-প্রান্তে টেবির চিতা সাজাইল।

দেখিতে দেখিতে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই

বনের বোঙার (দেবতার) পূজা দিয়া জলন্ত চিতার সুমুখে দাঁড়াইয়া শপথ করিল, এ অত্যাচারের প্রতিশোধ না লইলে তাহাদের শান্তি নাই। রাজার যে কোন লোক তাহাদের ত্রি-সীমানা মাড়াইবে, তাহাকেই এই টেবির মত নিষ্ঠুর ভাবে বিষাক্ত বানে হত্যা করা চাই!

সম্মুখে প্রজ্জলিত চিতার উপর এক নিরীহ যুবতীর শবদেহ,—চারিদিকে গভীর অরণ্য। মাথার উপরে আকাশ ভরা নক্ষত্র! সর্দ্দার আর-একবার ভাল করিয়া সকলকে প্রতিজ্ঞার কথা শুনাইয়া দিল। একে একে সকলেই তীর-ধনুক স্পর্শ করিয়া পুনরায় শপথ-বাণী উচ্চারণ করিল। স্তব্ধ বনানী শিহরিয়া উঠিল। বনের ধারে যে-সব শৃগাল ডাকিতে সুরু করিয়াছিল, তাহারা ভয়ে ভয়ে সরিয়া গেল।

চার

জঙ্গলে সেদিন গাছ কাটাইতে গিয়া সাঁওতালদের গুপ্তবাণে নায়েবের এক চাপরাশীর মৃত্যু হইল। কোথা হইতে কোন্ দিক দিয়া যে বাণটা আসিয়া তাহার গায়ে লাগিল, কেহ ঠাহর করিতে পারিল না।

নায়েবও তাহার প্রতিশোধ লইলেন।

কিছুদিন চুপ করিয়াই ছিলেন। তাহার পর একদা এক অন্ধকার গভীর নিশীথে নিরীহ সাঁওতালদের এই কুঞ্জ-কুটীরগুলি সহসা দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিল। পাতার কুঁড়ে নিমিষেই পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। নিকটে জল ছিল না, আর থাকিলেই বা এই অন্ধকার বনানী-প্রান্তে

মাটির কলসী দিয়া জল আনিয়া এক সঙ্গে এতগুলা ঘর তাহারা কেমন করিয়া বাঁচাইবে! স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া সকলেই নিজ নিজ প্রাণ বাঁচাইবার জন্য উন্মুক্ত প্রান্তরের উপর আসিয়া দাঁড়াইল।—আলোক-উদ্ভাসিত বন-প্রান্তে দাঁড়াইয়া স্বচক্ষে এই বিরাট অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া মনের বেদনা মনে মনে চাপিয়া রাখা ছাড়া তাহাদের আর কোন উপায়ও ছিল না।

সর্দ্দার বলিল,—ইথানে থেকে আর কি করবি,—চল্।

ব্যথিত স্বরে সকলেই বলিল,—চল্।

গৃহহীন নিঃসম্বল বনচারী এই সাঁওতালের দল এখানের ডেরা তুলিয়া আবার সেই বনের ধারে-ধারে সরু পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

কোথায় তাহাদের পথচলার শেষ এবং কোথায় তাহাদের রাত্রি প্রভাত হইবে, আবার কোথায় কোন্ নিরুপদ্রব জঙ্গলের ধারে এই স্বাধীন-চেতা আত্মবিশ্বাসী অনার্য্যের দল কুটীর বাঁধিবে, ভগবান জানেন!

কিন্তু একটা লোক পশ্চাতে পড়িয়া থাকিল। সে, টেবির বাবা লথাই।

বনের ভিতর যেখানে তাহার কন্যাকে হত্যা করা হইয়াছিল এবং যেখানে তাহাকে পুড়াইয়া নিঃশেষ করিয়া দিয়া আসিয়াছে, সমস্ত রাত্রিটা উন্মত্তের মত লথাই 'মা' 'মা' বলিয়া সেইখানে ছুটিয়া বেড়াইল।

পরদিন প্রভাতে নায়েবের লোক আসিয়া দরিদ্র-পীড়নের এই বীভৎস চিহ্নটুকু দেখিয়া গেল। আগুনের তেজে গাছগুলা ঝলসিয়া গিয়াছে,—তখনও জলন্ত আগুনের ফিন্‌কি বাতাসে উড়িয়া সেই ভস্মস্তূপের উপর খেলা করিতেছিল। বৈকালে পাকা ধানগুলি কাটিয়া গাড়ী বোঝাই করা হইল এবং দেখিতে দেখিতে সেগুলি জমিদারের সরকারী খামার-বাড়ীতে গিয়া উঠিল।

দিন-দুই পরে ভারি একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়া গেল। গ্রামময় রাষ্ট্র হইল, নায়েবের ছয় সাত বছরের কন্যাকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

অভাগা

প্রায় প্রত্যহই দেখিতাম, কয়লা-খাদের কাজ সারিয়া, সে তাহার জীর্ণ কুটীর খানির ভিতর চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া ঝিমাইত। বাহিরে হয়ত তখন সন্ধ্যারাগ-রঞ্জিত আকাশে বিচিত্র বর্ণের সমারোহ চলিতেছে,—অদূরে তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরের উপর, বর্ষাজলসিক্ত খানা-ডোবার ধারে-ধারে রক্ত-পুষ্পাভরণ পলাশের শ্রেণী মৃদুমন্দ সমীরান্দোলনে হেলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে, নিদাঘতপ্ত ধরিত্রী সন্ধ্যার স্নিগ্ধ অন্ধকারে শান্তি লাভ করিয়াছে, কিন্তু সে-সব সংবাদ লইবার অবসর বুড়ার ছিল না। বুড়া এমন করিয়া কি যে ভাবিত কে জানে। এক-একদিন সে এতবেশী বিভোর হইয়া পড়িত যে তাহার রাঁধিয়া খাইবার ইচ্ছাটুকু পর্য্যন্ত থাকিত না, সমস্ত রাত্রি হয়ত চুপ করিয়া বসিয়া কাটাইত। ঘরে-বাইরে বিরাট অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিলে, কখন-কখন উঠানের অযত্ন-সঞ্চিত আগাছার জঙ্গল হইতে সর্প-বৃশ্চিকাদি বিষাক্ত সরীসৃপের আগমন নিবারণ হেতু, কেরোসিনের ক্ষুদ্র ডিপেটি জ্বালিয়া উন্মুক্ত দুয়ারের

চৌকাঠের পাশে নামাইয়া রাখিত। কোনদিন-বা ঝড়ের ঝাপটায় আলোটা অকস্মাৎ নিভিয়া যাইত, আবার কোন-কোন-দিন আলো অপেক্ষা অত্যধিক ধূম উদ্গীরণ করিয়া, মরণাপন্ন রোগীর স্তিমিতপ্রায় প্রাণ-শিখার মতই মিট্-মিট্ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিত।

এম্নি করিয়া এই রাণীগঞ্জের কয়লা-কুঠিতে বৃদ্ধ টুইলা কতদিন ধরিয়া যে তাহার বিচিত্র জীবন যাপন করিতেছে, সে ইতিহাস কেহ জানে না। আত্মীয় স্বজন কেহ তাহার আছে কি-না, বা পূর্ব্বে কোনদিন ছিল কি-না, সে-কথা জিজ্ঞাসা করিলে বুড়া উত্তর দেয় না,—নীরবে শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া প্রশ্নকর্ত্তার মুখের পানে তাকাইয়া থাকে। কোটর-প্রবিষ্ট তাহার সে দুইটা চোখের তীব্রোজ্জ্বল দৃষ্টির দিকে তাকাইতে ভয় হয়—অদ্ভুত সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন বুকের তলায় বিঁধিতে থাকে।

একটা কিছু রহস্য নিশ্চয়ই আছে, তা না হইলে সে এরূপ করিবে কেন? সেটা যে কি, তাহাই জানিবার জন্য বড় বেশী উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলাম, কিন্তু তাহাকে সে-কথা জিজ্ঞাসা করিবার উপযুক্ত সুযোগ খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না।

একদা এক বর্ষা-সন্ধ্যায় মেঘে-মেঘে চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিল। ঘন-ঘন মেঘ ডাকিতে লাগিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ঝম্ ঝম্ শব্দে বাদল নামিল। নিঃসঙ্গ নির্ব্বান্ধব আমি—কয়লাকুঠিতে চাকুরী করিতে আসিয়াছি,—এই সময়টায় একাকী জানালার ধারে বসিয়া-বসিয়া বাহিরের এই ধারাবর্ষণ নিরীক্ষণ করা যে কত বড় দুর্ভোগ, তাহা আমি বেশ জানি। বৃদ্ধ টুইলার কথা মনে হইল। আমার জানালার

সম্মুখে, অদূরে ওই কয়লা-বিছানো কালো রাস্তাটার ধারে তাহার জীর্ণ কুটীরখানি এতক্ষণ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল,- এইবার ঘন বর্ষণের ভিতর সমস্তই ঝাপ্‌সা হইয়া উঠিয়াছে,—এখন আর ততদূর নজর চলিতেছে না। ভাবিলাম বাদলের ধারা একটুখানি ক্ষান্ত হইলেই তাহার নিকট রওনা হইব।

বৃষ্টি প্রায় ধরিয়া আসিল। ঘরের কোণ হইতে ছাতিটা লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া পড়িলাম। অন্ধকার পথের উপর দিয়া কিয়দ্দুর আসিতেই বৃষ্টি একেবারে থামিয়া গেল। পথের দুই পার্শ্বে খানা-ডোবাগুলা জলে ভরিয়া চিক্‌-চিক্‌ করিতেছে, এবং তাহারই আশে-পাশে ভেকের অশ্রান্ত কলধ্বনি সুরু হইয়াছে।

ধীরে-ধীরে টুইলার কুটীর-প্রাঙ্গনে গিয়া দাঁড়াইলাম। এ পথ দিয়া অনেকবার আসিয়াছি, টুইলার খড়ো চালটা মেরামত করিয়া দিবার জন্য কোম্পানীর কাজে এই বৎসর বর্ষার পূর্ব্বেই একাধিকবার এখানে আমার আসিবার প্রয়োজন হইয়াছে, কিন্তু আজিকার মত এ স্থানটা এত রহস্যময় বলিয়া কোনদিনই মনে হয় নাই। অন্ধকার উঠানের পাশে কয়েকটা বৃহদাকার গাছ হইতে বর্ষার জল তখনও টপ টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। খড়ো চালের ছাঁচ গড়াইয়া তখনও জল ঝরিতেছে। অপরিষ্কৃত উঠানের আগছাগুলার ভিতর ঝিঁঝিঁ-পোকা ডাকিতেছিল।

চালার একপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলাম,—মনে হইল, দুইটা লোক যেন ঘরের ভিতর বিড় বিড় করিয়া কথা বলিতেছে। ভিতরে বোধ হয় কেরোসিনের ডিবে জ্বলিতেছিল, তাহারই সামান্য আলোক কবাট-হীন উন্মুক্ত দরজার পথে নির্গত হইতেছে।

আমি সরাসর ভিতরে গিয়া ডাকিলাম, টুইলা!

আমার ভ্রম দূর হইল। দুইজন নয়,—টুইলা একাকী ঘরের মেঝের উপর আপাদ-মস্তক কাপড় জড়াইয়া আপন মনেই বকিতেছিল, আমাকে দেখিয়াই, ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া আমার মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। আবার সেই দৃষ্টি! এ যেন অন্তরের অন্তস্থল পর্য্যন্ত হাতড়াইয়া দেখিয়া লইতে চায়—আমি কে, এবং কি প্রয়োজনে আসিয়াছি।

—ও তুই! বলিয়া, সে মুখ ফিরাইয়া প্রজ্জ্বলিত কেরোসিনের ডিবেটার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। আমি নিষ্কৃতি পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম বটে, কিন্তু ভাবিতেছিলাম, আমার প্রয়োজনের কথা তাহাকে কেমন করিয়া বলি। এতক্ষণে বুড়াকে দেখিয়া মনে হইল, নিতান্ত খাম্-খেয়ালী পাগলের মতই আমি এখানে আসিয়াছি। বুড়ার অতীত ইতিহাস যাহাই হউক না কেন, তাহাতে আমার কোনই প্রয়োজন নাই।

এমন ভাবে দাঁড়াইয়া থাকাটা নিতান্ত অশোভন বলিয়া মনে হইতেছিল, তাই প্রশ্ন করিলাম,—তোকে ত' নিজেই রাঁধিয়া খাইতে হয়, আজ রাঁধিস্ নাই কেন?

টুইলা গম্ভীর ভাবে বলিল, না।

সেই স্যাঁৎসেতে মেঝের উপরেই আমি বসিয়া পড়িলাম। বলিলাম, টুইলা, আমার একটি কথা রাখবি?

—কি?

—তুই কি জীবনে খুব কষ্ট পাইয়াছিস্?

—না।

আমি বলিলাম, তুই যে এইরূপ ভাবে একলা থাকিস্,—দেখিবার শুনিবার কেহ নাই,—ইহাতে কি তোর কষ্ট হয় না?

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া টুইলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না!

আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, তুই কি কখনও বিয়ে করিয়াছিলি? —বৌ বুঝি মরিয়া গেছে?

এইবার তাহার চক্ষুদুইটা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কোন উত্তর না দিয়া আমার মুখের পানে কট্‌মট্‌ করিয়া তাকাইতে লাগিল। বুড়ার ভাব-গতিক দেখিয়া আমার প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হইল। সে যেন তাহার জ্বলন্ত ভাঁটার মত চোখ দুইটা দিয়া আমায় পুড়াইয়া মারিতে চায়। ভয়ে-ভয়ে আমি সেদিক হইতে মুখ ফিরাইলাম, আর কোন প্রশ্ন করিলাম না। কিছুক্ষণ পরে টুইলা সন্দিগ্ধ-নয়নে আমার দিকে বার-কতক্ কটাক্ষ হানিয়া গায়ে তাহার কাপড়টা বেশ করিয়া জড়াইয়া লইয়া, পূর্ব্বের মত শুইয়া পড়িল।

আমি এইবার ধীরে-ধীরে কহিলাম,—বল্ না টুইলা,—বলিতে দোষ কি?

বিরক্ত হইয়া সে জোরে-জোরে কহিয়া উঠিল, না, না, আমি জানি না। তুই যা বাবু।

নিতান্ত নির্ব্বোধের মত, সামান্য আগ্রহের বশবর্ত্তী হইয়া যে অনধি-কারচর্চ্চা করিতে গিয়াছিলাম, এইবার মুখের মত উত্তর পাইলাম। ঠিক্ত! যে দুঃখ-দেবতার অনুগ্রহে সে আজ অমূল্য সম্পদের অধিকারী হইয়াছে—যাহার জোরে সে আজ মরণের দিন পর্য্যন্ত তাহার নিঃসহায়

নিরবলম্ব জীবনের অশেষবিধ বেদনা-দুর্ভোগ নীরবে সহ্য করিয়াছে, যে দুঃখ তাহাকে আজ পৃথিবীকে চিনাইয়াছে, সে পরশমণির [illegible] যার-তার কাছে বলিয়া বেড়াইবে কিসের জন্য ?

আমি সেদিনের মত ধীরে-ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া আসিলাম।

তাহার পর, কয়েকদিন ধরিয়া বুড়ার কোন সংবাদ লইতে পারি নাই সংবাদ লইবার তেমন ইচ্ছাও ছিল না।

দিন-দুই পরে, শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, যে, সেই অদ্ভুত জীবটি রাণীগঞ্জ কয়লা-কুঠি হইতে কবে এবং কোন্ সময় হঠাৎ অন্তর্হিত হইয়া গেছে। কোথায় গিয়াছে, সে সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ কেহই অবগত নহে।

কথাটা শুনিয়া অবধি আমার মনটা কেমন যেন উন্মনা হইয়া পড়িল। তবে কি আমিই তাহাকে পলাইয়া যাইতে বাধ্য করিলাম? কিংবা হয়ত এম্‌নি করিয়া যেখানে-সেখানে ঘুরিয়া বেড়ানোই তাহার কাজ— হয়ত' এমনি করিয়াই পথের ডাকে সে তাহার ঘরের সুখ-সুবিধা, আশ্রয়ের শান্তি, বারে-বারে পায়ে দলিয়া চলিয়া যায়।

তাহার পর সুদীর্ঘ পাঁচটি বৎসর, কর্ম্মচক্রে ঘুরিতে-ঘুরিতে অনেক নূতন-নূতন কয়লা-কুঠিতে কাজ লইয়া ফিরিয়াছি, কিন্তু সে বৃদ্ধের সাক্ষাৎ পাই নাই।

তপসী কয়লাকুঠিতে চাকরী লইয়া আসিলাম। জায়গাটা আমার বেশ পছন্দ হইয়াছিল। বাসার পাশেই 'সিঙ্গারণ' নদী,—সম্মুখে বিস্তৃত

প্রান্তরের উপর পুষ্পিত পলাশের বন। বহু পুরাতন পরিত্যক্ত কয়লা-কুঠিগুলা এখন নানা শ্রেণীর বৃক্ষ-লতাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহার বুকের মধ্য দিয়া চলাচলের একটা সরু লাল কাঁকরের পথ-রেখা বরাবর রেলওয়ে-ষ্টেশনে গিয়া পৌঁছিয়াছে। জঙ্গলের মাঝে পুরাতন ইঁটের বাড়ী ও চিম্‌নিগুলা দাঁত বাহির করিয়া কঙ্কালসার অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে। মানুষে আর তাহাদের যত্ন লয় না বলিয়া প্রকৃতি-মাতা ধীরে-ধীরে এই অযত্ন-পরিত্যক্ত মানবকীর্ত্তিগুলিকে নিজের কোলে টানিয়া লইতেছেন। তাহাদের ভগ্ন প্রাচীর বাহিয়া লতাগুল্ম উঠিয়াছে,—ফাটলের ভিতর গাছ গজাইয়াছে,—ইঁটের উপরে শ্যামল শ্যাওলার রং ধরিয়াছে।

একদা সন্ধ্যার পূর্ব্বে অফিসে বসিয়া আছি, এমন সময়ে কুঠির একজন চাপরাশী আসিয়া সংবাদ দিল, সাত নম্বর কুলি-ধাওড়ার পাশে যে পলাশ বনটা আছে, সেইখানে বসিয়া কয়েকজন কুলি জুয়া খেলিতেছে,—আপনাকে একবার যাইতে হইবে।

তাহাকে সঙ্গে লইয়া সেখানে গিয়া দেখিলাম, পূর্ণিমার জ্যোৎস্না বিধৌত প্রান্তরের উপর একটা গাছের তলায় কয়েকজন ছোক্‌রা জুয়া-খেলায় মাতিয়া উঠিয়াছে। আমাকে দেখিয়াই অন্য সকলে ছুটিয়া পলাইল,—মাত্র একটা পনর-ষোল বছরের ছোক্‌রা পলাইবার পথ না পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহাকে দেখিয়া ঠিক্ সাঁওতালের ছেলে বলিয়া মনে হইল না। গায়ের রং তত বেশী কালো নয়,—চোখের তারা দুইটা বিড়ালের মত।

আমাকে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, সে পিছন্ ফিরিয়া

ছুটিতে আরম্ভ করিল। আমিও বাধ্য হইয়া তাহার পিছু-পিছু ছুটিলাম। সাত নম্বর কুলিধাওড়ার যে ঘরটায় সে ঢুকিয়া পড়িল, আমিও তাহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু ছেলেটাকে ঘরের মধ্যে দেখিতে না পাইয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম। এইমাত্র সে ঘরে ঢুকিয়া কোথায় চলিয়া গেল? বাহিরের এক ঝলক্ জ্যোৎস্না আসিয়া ঘরের মেঝের উপর পড়িয়াছে। আস্‌বাবপত্রের মধ্যে কয়েকটা হাঁড়ি কলসী এবং একটা তীর-ধনুক ছাড়া আর কিছুই নাই। ঘরের এক-দিকের একটা অন্ধকার কোণের কাছে কে একটা লোক জীর্ণ মলিন শয্যার উপর জ্বরের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। তাহার গায়ে একটা কাপড় জড়ানো। ছেলেটা তাহারই পাশে কোথাও লুকাইয়া আছে ভাবিয়া, পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া জ্বালিলাম। সম্মুখে একটা কেরোসিনের ডিবে পড়িয়াছিল, সেইটা ধরাইয়া দিতেই, সেই সামান্য আলোকে ঘরের প্রত্যেকটি জিনিষ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। দেখিলাম, ছেলেটা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া বিছানার নীচে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু অসাবধানতাবশতঃ তাহার পা দুইটা ঢাকা পড়ে নাই। আমি ঈষৎ হাসিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিতে গেলাম কিন্তু শায়িত রোগীর মুখের পানে তাকাইয়া একেবারে চমকিয়া উঠিলাম। প্রথম দৃষ্টিতেই চিনিলাম, এ সেই বৃদ্ধ টুইলা ব্যতীত আর কেহ নহে।

আলোটা তাহার মুখের কাছে ভাল করিয়া তুলিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, টুইলা, তুই এখানে থাকিস্ নাকি?

টুইলার চোখের সে ভয়ানক জ্যোতি আর নাই,—জীবন-নদীর খেয়া-পারে আসিয়া এখন তাহার অনেকখানা পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

সে আমার মুখের পানে অনেকক্ষণ ধরিয়া অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, তাহার পর চিনিতে পারিয়া বলিল,—তুই এখানে কেন আসিয়াছিস্ বাবু?

বলিলাম, এই ছেলেটাকে ধরিয়া লইয়া যাইব,—সে জুয়া খেলিতেছিল।

টুইলা স্পষ্ট বলিল, কই, এখানে কোন ছেলে থাকে না।

সে হয়ত ভাবিয়াছিল, আমি তাহাকে দেখিতে পাই নাই।

ছেলেটা যে-ভাবে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়াছিল, ভাবিলাম, আর বেশীক্ষণ সে-অবস্থায় থাকিলে হয়ত দম বন্ধ হইয়া ভবলীলা সম্বরণ করিবে, তাই তাহার পা ধরিয়া টানিয়া দিয়া বলিলাম, ওঠ্—তোর ভয় নাই।

ছেলেটা ভয়ে-ভয়ে বিছানার তলা হইতে বাহির হইয়া আসিল।

টুইলা একবার ছেলেটার মুখের পানে তাকাইল, পরে আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, ইহার জন্য আমার রৌপ্যাকে আর শাস্তি দিস্ না বাবু। সে সখ করিয়া জুয়া খেলে নাই,—আমাকে বাঁচাইবার জন্য, আমার ঔষধের দামের জন্য সে জুয়া খেলিয়া রোজগার করিতে গিয়াছিল। ...এই খানে ভাল করিয়া বসিয়া শোন্—তোকে আজ সব কথাই খুলিয়া বলি।

আবার সেই পূর্ব্বের কৌতূহল জাগিয়া উঠিল। চাপরাশীকে বিদায় করিয়া দিয়া বৃদ্ধের শিয়রের কাছে গিয়া বসিলাম। অদূরে কেরোসিনের ল্যাম্পটা মিট-মিট করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

সে বলিতে আরম্ভ করিল, আমি মরিয়া গেলে রৌপ্যাকে স্নেহ যত্ন করিবার লোক দুনিয়ায় আর কেহই থাকিবে না, তাহা সে জানে এবং

সেই জন্যই সে প্রাণ দিয়া আমাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চায়। আমিও শুধু তাহারই জন্য মরিতে পারিতেছি না।

টুইলা হঠাৎ থামিয়া গেল। রোপ্পার দিকে তাকাইয়া বলিল,—রোপ্পা, তুই এখন বাইরে যা!

রোপ্পা ধীরে-ধীরে বাহির হইয়া গেল। টুইলা বলিল,—রাণীগঞ্জের কুঠিতে তোকে একদিন তাড়াইয়া দিয়াছিলাম, সে-কথা আমার মনে আছে।…কথা এমন বেশী কিছুই নয়, তবে তুই জানিতে চাহিয়াছিলি বলিয়াই জানাইতেছি।

'প্রথমেই বলিয়া রাখি, আমি চোর,—আমি খুনী আসামী! একমাত্র ওই ছেলেটার জন্যই আমি আজ পর্য্যন্ত নিজের কাছেই সে-কথা গোপন রাখিয়াছি। আর আমার ধরা-পড়িবার ভয় নাই,—আর আমি বেশীদিন বাঁচিব না।

'তখন আমার জোয়ান্ বয়স। ঝরিয়ার কাছে একটা কুঠিতে কাজ করিতাম। আমার স্ত্রীর নাম ছিল মতিয়া। সে ছিল ঠিক পরীর মতন সুন্দরী। গাছ যেমন মাটিকে ভালবাসে,—সেও আমাকে তেম্‌নি ভালবাসিত। তাহাকে পাইয়া কুঁড়ে ঘরে বসিয়াও আমি ভাবিতাম, রাজা হইয়াছি। যাক্, তাহার কথা বেশী বলিতে গেলে হয়ত তোকে আর কিছু বলা হইবে না।

'আমাদের যে ম্যানেজার-সাহেব ছিল, তাহার স্বভাব ছিল বড় খারাপ। সে আমাদের পা দিয়া দলিত। ভাবিত, ছোট-জাতের ভালবাসা বলিয়া কোন জিনিষ নাই। সাহেব মাহিনা দিয়া একটা লোক রাখিয়াছিল,—পয়সার লোভ দেখাইয়া, জোর-জবরদস্তি করিয়া সাহেবের কাছে ছুকরী

মেয়েদের ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করানোই ছিল সে লোকটার কাজ।

'আমার মতিয়ার উপর সে শয়তানের যে কখন্ নজর পড়িয়াছিল জানি না। আমি কাছে থাকিলে মতিয়ার গায়ে হাত দিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না।

'একদিন হাসি-ঠাট্টা করিয়া মতিয়াকে বলিয়াছিলাম,—আচ্ছা মতিয়া, সাহেব যদি তোমাকে ধরিয়া লইয়া যায়, তুমি কি করিবে ?

'মতিয়া রাগিয়া উঠিত, বলিত, ছেলে-খেলা কি-না !

'আমি খুব জেদ্ ধরিয়া বসিলে বলিত, জলে ডুবিয়া মরিব।

'রথযাত্রার দিন মতিয়াকে লইয়া শিয়ারশোলে রথ দেখিতে গিয়াছিলাম। হঠাৎ লোকের গোলমালে মতিয়াকে খুঁজিয়া পাইলাম না। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত খুঁজিলাম, তন্ন-তন্ন করিয়া প্রত্যেক লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু সেখানে তাহার সন্ধান মিলিল না। ভয়ে আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি ধাওড়ায় ফিরিয়া আসিলাম।—দেখিলাম সেখানেও নাই। আবার রথ-তলার দিকে ছুটিলাম। আবার ফিরিলাম। সাহেবের বাংলা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক কুলিধাওড়ায় সন্ধান লইলাম, কিন্তু সমস্ত রাত্রির মধ্যে মতিয়াকে পাওয়া গেল না।

'পরদিন দুপুরে সংবাদ পাইলাম, শিয়ারশোলের রাণী-সায়রের জলে মতিয়ার মৃতদেহ ভাসিয়া উঠিয়াছে।...পাগলের মত ছুটিয়া গেলাম, কিন্তু তখন আর গেলেই বা কি হইবে ! সে ত' আমাকে আগেই বলিয়াছিল। পুলিশের হাঙ্গামা মিটাইয়া আমি তাহার সৎকারের ব্যবস্থা করিলাম।

বুঝিলাম সবই।

'প্রতিহিংসা লইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিলাম। দিনকতক পরে একদিন শুনিলাম, সাহেব কি-একটা কাজের জন্য আসনসোল গিয়াছে। সঙ্গে বিষাক্ত তীর লইয়া রাত্রির অন্ধকারে তাহার বাংলার দিকে চলিতে লাগিলাম।

'রাত্রি যে কত হইয়াছিল, ঠিক জানি না। সাহেব তখনও ফিরে নাই। বাহিরের বারান্দা হইতে দেখিলাম, একটা ঘরের মেঝের উপর খান্‌সামা দুইজন নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। মাঝের ঘরে, দেওয়ালের গায়ে একটা আলো জ্বলিতেছিল, তাহারই ক্ষীণ আলোকে দেখিলাম, একটা পালঙ্কের উপর মেম্‌-সাহেব শুইয়া আছে। কাল-বিলম্ব না করিয়া তাহারই উদ্দেশে তীর ছুঁড়িলাম। বিষাক্ত তীর তাহার কপালের কাছে রগ্‌ ঘেঁসিয়া বিঁধিয়া গেল। তাহাকে আর উঠিতে হইল না। চির জন্মের মত ঘুম পাড়াইয়া দিলাম। মতিয়ার মৃত্যু ভুলিয়া গেলাম,—নিজেকে ভুলিলাম, জগৎ-সংসার ভুলিলাম। আনন্দে তখন আমার বুকখানা ফুলিয়া উঠিয়াছে। সাহেব যখন আসিয়া দেখিবে, তাহার স্ত্রী মরিয়াছে, তখন বুঝিবে, মতিয়া মরায় আমার প্রাণে কতখানি আঘাত লাগিয়াছে।

'তীরখানা তাহার মাথা হইতে তুলিয়া লইবার জন্য ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। গিয়া দেখি, মৃত জননীর পার্শ্বে একটি ফুটফুটে সুন্দর ছেলে মিট মিট করিয়া তাকাইতেছে। তাইত!—তখন আমার ভাবিবার সময় ছিল না। কচি ছেলেটিকে একহাত দিয়া বুকে তুলিলাম, অন্য হাতে তাহার মাতার মস্তক হইতে বিষ-বাণখানা টানিয়া বাহির করিলাম। আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলাম না। ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া সেখান হইতে পলাইয়া গেলাম।

'তাহার পর সেই ছেলেটাকে লুকাইয়া রাখিবার জন্য যে কষ্ট পাইয়াছি, একটি একটি করিয়া সে-সব কথা বলিবার ক্ষমতা আজ আমার নাই। সাহেবের ছেলে আমাদের মত কালা-আদ্‌মীর কাছে নিজের ছেলে বলিয়া প্রচার করাও চলে না। সাঁওতাল-পরগণার এক পাহাড়ের পাশে আমাদের যেখানে আদি বাসস্থান,—সেখানে আমার এক বোনের কাছে তাহাকে রাখিয়া আসি। তাহার পর বোনও যখন কয়লাকুঠিতে চাক্‌রী করিতে আসিল, তখন তাহাকে আর কোথায় ফেলিয়া আসিবে? সঙ্গে লইয়াই আসিল। রৌপ্পার রংটাও তখন ময়লা হইয়া গিয়াছিল,—সাঁওতালী কথাও বেশ বলিতে পারিত! আমি মরিয়া গেলে রৌপ্পাকে মাঝে-মাঝে দেখিস্ বাবু!...এই সেই রৌপ্পা।'

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই টুইলা চুপ করিল।

আমি বলিলাম, আজ তবে আসি।

—আচ্ছা যা। রৌপ্পাকে দেখিতে পাইলে পাঠাইয়া দিস্। তাহাকে যেন এসব কথা বলিস্ না।

আমি বাহিরে আসিলাম, কিন্তু রৌপ্পাকে দেখিতে পাইলাম না।

পরে কোম্পানীর কাজে দিনকয়েকের জন্য আমাকে কলিকাতা যাইতে হইল।

আমি একটা 'ফ্যামিলি কোয়াটার' পাইয়াছিলাম। কলিকাতা হইতে ফিরিবার পথে আমার স্ত্রীকে সেখানে লইয়া যাইব মনে করিয়া দেশে গেলাম।

টুইলার কথা আমি রাখিতে পারি নাই। তাহার নিষেধ স্বত্ত্বেও আমার স্ত্রীকে তাহার জীবন-কাহিনী শুনাইলাম। তিনি বলিলেন,

কুঠিতে গিয়া রৌপ্নাকে আমার কাছে একবার আনিও। আমি তাহাকে দেখিতে চাই।

সস্ত্রীক কর্ম্মস্থলে ফিরিলাম। রৌপ্নাকে ডাকিবার জন্য সেদিন রাত্রে সাত নম্বর কুলিধাওড়ায় গিয়া তাহার দেখা পাইলাম না। শুনিলাম, টুইলা মারা গেছে এবং তাহার পরদিন হইতে রৌপ্না ধাওড়া ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেছে কেহ বলিতে পারে না।

নদীর কিনারে যে-পথটি গিয়াছে, সেই পথ ধরিয়া বাসায় ফিরিতে-ছিলাম। নির্মেঘ নীল আকাশের গায়ে চাঁদ উঠিয়াছে। চন্দ্রকিরণের স্নিগ্ধ স্পর্শে উল্লসিত বনানী মাতালের মত টলিতেছে। রক্তবর্ণ পলাশের ফুলগুলি নদীজলে প্রতিফলিত হইয়া ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া পড়িতেছে। শ্যামা বসুন্ধরার এই সজীব সৌন্দর্য্যের মাঝে পথ চলিতে চলিতেও আমার চিত্ত, বারে-বারে ক্ষুব্ধ ব্যথিত হইয়া উঠিতেছিল!...পিতৃহীন, মাতৃহীন, গৃহহীন, আশ্রয়হীন কোন্ এক পথের কাঙ্গাল, তাহার উদ্দেশ্যহীন জীবন লইয়া এতক্ষণ হয়ত' ঠিক্ আমারই মত কোন্ এক অজানা প্রান্তরের উপর পথ চলিতেছে, কে জানে! চির জীবন ধরিয়া এমনি করিয়াই হয়ত সে অভাগা তাহার জন্মদাতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

বিবাহ

বিবাহের কথায় মানুষের যে এত আনন্দ হইতে পারে তাহা আমাদের খোঁড়া পল্‌হান্‌কে না দেখিলে বুঝিবার উপায় নাই। পল্‌হান্ জাতিতে সাঁওতাল। কবে কোন্ পুরাকালে যে তাহারা তাহাদের সাঁওতাল-পরগণার বাস উঠাইয়া দিয়া বর্দ্ধমান জেলার এই কয়লা-কুঠিতে কয়লা-কাটা কুলির কাজ করিতে আসিয়াছে তাহা কেহ জানে না। পল্‌হান্ জানে—তাহার বাবাও এই কয়লার খনিতে কাজ করিয়াছে, আবার তাহারা তিন ভাই—তাহারাও এইখানে কাজ করিতেছে। তবে পল্‌হানের আজকাল আর কাজ করিবার শক্তি নাই। খাদের নীচে কয়লা কাটিতে গিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে তাহার পায়ের উপরেই কয়লার একটা প্রকাণ্ড চাংড়া ছাদ হইতে খসিয়া পড়ে। চাংড়াটা তাহার মাথায় পড়ে নাই তাই রক্ষা, তাহা না হইলে আজ আর তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইত না। ইহাতেও তাহার বাঁচিবার আশা-ভরসা একরকম ছিল না বলিলেই হয়। প্রথমে কুঠির বনমালী ডাক্তারই তাহার চিকিৎসা করিতে-

ছিল, কিন্তু দুইটা পা-ই যখন তাহার পাকিয়া উঠিল বনমালী-ডাক্তার তখন আর সাহস করিয়া পলহানকে নিজের চিকিৎসাধীনে রাখিতে পারিল না। ঘোড়ার গাড়ীতে চড়াইয়া একদিন তাহাকে আসনসোলের হাঁসপাতালে নিজে সঙ্গে গিয়া ভর্তি করিয়া দিয়া আসিল। সেখানে ছ' মাস থাকিবার পর পল্‌হান্‌ যখন আবার এই কয়লা-কুঠিতে ফিরিয়া আসিল, দেখা গেল তাহার ডান-পায়ের হাঁটুর নীচের দিকটা কাটা পড়িয়াছে—এবং এখন তাহাকে দুই বগলে দুইটা লাঠির মত ঠেঙ্গোর উপর ভর দিয়া খোঁড়াইয়া-খোঁড়াইয়া চলিতে হয়!

পা যাক্ ক্ষতি নাই, কিন্তু পল্‌হানের সব চেয়ে বেশি চিন্তার বিষয় হইল যে, আগে যদি-বা তাহার বিবাহের আশা-ভরসা কিছু ছিল এখন আবার তাও গেল। তাই সে খোঁড়া পায়ের দুঃখে যতটা না হউক, বিবাহের দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া তাহাদের ধাওড়ার সুমুখে কয়লার গুঁড়া বিছানো পথের ধারে পত্রহীন শীর্ণ একটা কুলগাছের তলায় দিবসের প্রায় অধিকাংশ সময় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

এমনি করিয়াই দিন কাটিতেছিল, হঠাৎ সেদিন পিন্টু মাঝি ওই রাস্তা দিয়া পার হইতেছিল, পল্‌হানকে দেখিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'ছাখ্‌ পল্‌হান্‌, তুর্‌ বিয়ের ঠিক আমি করে' দিতে পারি। এক্‌টো খুব ভাল মেয়ে আছে আমার হাতে। বিয়া করবি ?'

আহ্লাদে একেবারে আটখানা হইয়া গিয়া পল্‌হান্‌ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হঁ, কেনে কর্‌ব নাই ? কবে করতে হবেক্ বল্‌।'

পল্‌হানের খুশী যেন আর ধরে না!

পিন্টু বলিল, 'দাঁড়া, থাম্‌। সে ত' ইখানে লয়। বহুৎ দূর্‌। বীরভূঁই

জিলায়। কালকে আমি যাই—যেয়ে ঠিক করে' আসি-গা তা হ'লে।'

'হঁ তুঁই ঠিক্ কর্। আমি রাজি। তুর পায়ে ধরছি পিন্টু, তুঁই কালকেই যা তার কাছে।' বলিয়া বিবাহের আনন্দে পল্হান্ তাহার পায়ে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল।

পিন্টু খানিক্ পিছাইয়া গিয়া বলিল,—'পায়ে ধরতে হয় না, ছি! আমি তুর বিয়া ঠিক করে' দিচ্ছি দাঁড়া।'

বলিয়া—সেদিনের মত সে চলিয়া গেল।

দিনকতক পরে পিন্টু ফিরিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে সংবাদ দিল যে, বিবাহের সমস্ত বন্দোবস্তই ঠিক হইয়া গেছে। আগামী মাসে বীরভূঁই জেলার কোন্ একটা জঙ্গলের ভিতর সাঁওতালদের যে বস্তিটা আছে সেইখানেই একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে পল্হানের বিবাহ হইবে।

আগামী মাস! অর্থাৎ এখন হইতে পুরা একটি মাস দেরি। পল্হান্ দিন গুনিতে লাগিল।

কিন্তু সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে পল্হানের মত খোঁড়া অকর্ম্মণ্য মানুষের বিবাহ—শুনিলে একটুখানি বিস্মিত হইবারই কথা।

তবে—এই সাঁওতাল জাতির বিবাহ-পদ্ধতির কথা যাঁহারা জানেন তাঁহাদের বিস্মিত হইবার কিছু নাই।

উহাদের সমাজে দুশ্চরিত্রা নারী যদি কেহ থাকে ত' সমাজ-পতিরা

এমনি করিয়াই কানা-খোঁড়া অকর্ম্মণ্য লোকের সঙ্গে বিবাহ দিয়া সেই কলঙ্কিতা নারীর শাস্তি বিধান করে। এ-ক্ষেত্রেও যে তাহাই হইবে, ইহা জানা কথা। পল্‌হানের তাহাতে আপত্তি নাই। কারণ শুধু বিবাহ ত' নয়, কানা-খোঁড়া সেই অকর্ম্মণ্য স্বামীর ভরণ-পোষণের ভারও সেই মেয়েটার উপরেই গিয়া পড়ে। ইহাই নিয়ম। এমনি করিয়াই তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। সুতরাং পল্‌হান্ সব দিক দিয়াই বাঁচিয়া যাইবে। খোঁড়া হইবার পর হইতে সে নিজে আর রোজগার করিতে পারে না, ছোট দুইটি ভাই-এর রোজগারে অতি কষ্টে তাহার দিন চলে।

তাহার উপর পিন্টু বলিয়া গেছে—তাহাদের স্বামী-স্ত্রীর খাওয়া-পরার ভাবনা কোনোদিনই ভাবিতে হইবে না, কারণ—মেয়েটার মা-বাপ মরিবার সময় কিছু জমি-জায়গা রাখিয়া গেছে, তাহাই যদি দেখিয়া শুনিয়া চাষ-আবাদ করিতে পারে ত' দু'টা লোক ত' দূরের কথা, আরও জনকতক্ লোকের খাওয়া-পরা তাহাতেই চলিয়া যায়। সুতরাং এমন সুবিধা হাত-ছাড়া করিতে নাই।

পল্‌হান্ তাই বারে-বারে পিন্টুর কাছে যাওয়া-আসা আরম্ভ করিয়াছে। বিবাহের সম্বন্ধটি যখন দয়া করিয়া পিন্টু ঠিক করিয়া দিয়াছে তখন সেটা যেন আর কোনো প্রকারেই হাত-ছাড়া না হয়।

পিন্টু থাকে সিদ্ধেশ্বরী-ধাওড়ায়। সেখান হইতে অনেকখানি পথ।

—তা হোক্।

দুই হাতে দুইটা লাঠি ধরিয়া সে এক অদ্ভুত উপায়ে পল্‌হান্‌ পথ চলিতে লাগিল।

বাঁ-হাতের মাংসপেশীগুলা বেশ শক্ত সবল; জোর বোধকরি ওই-হাতেই বেশি পড়ে!

সাইডিং-লাইনের ওপারে গাদা-করা কতকগুলা কয়লার পাশে ছোট ভাই মতিয়ার সঙ্গে দেখা। হাতে তাহার দুইটা মোটা-মোটা রূপার বালা, —সাদা বালা; অন্ধকারে মন্দ দেখায় না! শিকে-ঝোলানো কেরোসিনের মগ-বাতিটার মুখে ভব্‌ ভব্‌ করিয়া বিস্তর ধোঁয়া বাহির হইতেছিল।

দাদাকে দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, 'ওকাতেম্‌ চালাঃ' আ?'—অর্থাৎ যাস্‌ কোথা?'

পল্‌হান্‌ বলিল, 'ছাগল খুঁজতে।'

মতিয়া বলিল, 'আঁধারে যাস্‌ না; তুঁই ঘরকে চল্‌।'

'না, দেখে আসি।'

'ছাগল এসেছে। তুঁই জানিস্‌ না দাদা।'

'জানি, জানি—।'—বলিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পল্‌হান্‌ আগাইয়া গেল।

মতিয়া আর-কিছু বলিল না। হাত পাঁচ-ছয় গিয়া সে একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইল। অদূরে পুরাতন পরিত্যক্ত সিঁড়ি-খাদের মুখে বোয়ান-গাছের ঝোঁপগুলা পার হইয়া মনে হইল যেন পল্‌হানের অন্ধকার অবয়ব ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া যাইতেছে;—লাঠির ঠুক্‌-ঠুক্‌ শব্দ হইতেছিল।

তিন-নম্বর কুলি-ধাওড়ার সুমুখে কয়লার গাদায় আগুন ধরানো হইয়াছে। তাহারই জলন্ত শিখায় পথের অনেকখানা দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। খোঁড়া পল্‌হানকে দেখিবামাত্র বাউরীদের কতকগুলা উলঙ্গ ছেলে-মেয়ে চেঁচাইতে চেঁচাইতে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া তাহার পিছন ধরিল।

'—খোঁড়া ঠ্যাং ঠ্যাং ঠ্যাং
ছাগল চরাতে যেঁয়ে ভাঙ্গাই এলো ঠ্যাং
খোঁড়া ঠ্যাং ঠ্যাং ঠ্যাং!—'

ঠ্যাঙ্গা উঁচাইয়া পল্‌হান্ তাহাদের মারিতে গেল।
ভয়ে কতকটা পিছাইয়া গিয়া তাহারা আবার সুরু করিল,—

'—ডান-ট্যাংটো লটর্-পটর বাঁ-ট্যাংটো খোঁড়া
বাবা বদ্যিনাথের ঘোঁড়া
বাবা বদ্যিনাথের ঘোঁড়া!—'

সেদিকে আর সে ফিরিয়া তাকাইল না, বিড়্ বিড়্ করিয়া কদর্য্য ভাষায় তাহাদের গালাগালি দিতে দিতে পল্‌হান্ আগাইয়া চলিল। অথচ একটি মাত্র পায়ের জোরে তাড়াতাড়ি হাঁটাও যায় না।

সিদ্ধেশ্বরী-ধাওড়ায় যখন সে গিয়া পৌঁছিল সন্ধ্যা তখন অনেকক্ষণ

উত্তীর্ণ হইয়া গেছে। কিন্তু ধাওড়ার সুমুখে সাঁওতাল-কুলিদের মজলিস তখনও ভাঙে নাই। দিনের আলোয় পৃথিবীর বুকের তলায়, অন্ধকার পাতাল-গহ্বরের সুড়ঙ্গপথে সারাদিন ইহারা কয়লা কাটে, তাহার পর রাত্রির অন্ধকারে—দিনের আলো যখন নিবিয়া আসে,—কালিতে-কয়লায়, ঘামে ও ধোঁয়ায় কুশ্রী কদাকার এই কয়লা-কাটার দল তখন একে-একে ধীরে-ধীরে উপরে উঠিতে থাকে,—মদ খায়, গান গায়, আমোদে-আহ্লাদে দিনের পরিশ্রম ভুলিবার চেষ্টা করে। সে-হল্লা তাহাদের থামিতে একটুখানি দেরি হয়।

ধাওড়ার চালায় মেয়েদের তখন রান্না চড়িয়াছে।

পিন্টু মাঝি ভাল গান গাহিতে পারে। কে-একটা লোক মাদল বাজাইতেছিল আর নেশার ঝোঁকে পিন্টু তাহার মাথায় হাত দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে ছিল।

উঠানের একপাশে কয়লায়-ধরানো আগুন তখনও ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে।

পল্‌হান্‌কে দেখিবামাত্র পিন্টুর নাচন্ থামিল; হাত বাড়াইয়া বলিল, 'হঁ আয়, তুখেই খুঁজ্‌ছিলম্। লে—লাচ্ দেখি একবার, আমি গায়েন্ করি, আর—'আপে দো তুম্‌দাঃ' রূইপে আর তিরিও অরংপে।'—অর্থাৎ তোরা মাদল আর বাঁশী বাজা!

হাঁড়া হইতে মদ ঢালিয়া মাটির ভাঁড়টি খোঁড়া পল্‌হানের হাতে দিয়া বলিল, 'লে, এগুতে পাউরাটো খেঁয়ে লে।'

'পাউরা' খাইয়া ভাঁড়টি ধীরে-ধীরে হাত হইতে নামাইয়া পল্‌হান্ বলিল, 'আমি এসেছিলম তুর কাছ্‌কে একবার......সেই'—

কিন্তু পিন্টুর তখন বেশ নেশা ধরিয়াছে, সে-কথায় কান দিল না; ঝিমাইতে ঝিমাইতে সবাইকে শুনাইয়া বলিতে লাগিল, 'দেখ্, এগুতে আমাদের গায়ের রং ছিল ঠিক্ 'শাঁকের'র মতন সাদা.—তা'বাদে হলো-কি, একদিন আমরা 'সিং-চাঁদো'র পূজো করতে গেলম্ ভুলে'—বাস্! সুয্যিঠাকুর গেল রেগে। রেগে বল্লেক কি? না,—আমার পূজো যখন তুরা করলি নাই, তখন তুরা-সব অন্ধকার রাতের মতন হঁয়ে যা! বাস্। সেই থেকে আমাদের চামড়ার রং হঁয়ে গেল—কালি অন্ধকার। শুন্‌লি? শুন্‌লি সব?'

হুডুম্ মাঝি বলিয়া উঠিল, 'হঁ—শুন্‌লম্।'

কিন্তু যে-কাজের জন্য খোঁড়া-পল্‌হান্ কুঠির এতটা অন্ধকার পথ হাঁটিয়া ছাগল খুঁজিতে এখানে আসিয়াছে সে-কথা সে ভুলে নাই। এই সুযোগে পট্ করিয়া পিন্টুকে সে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, 'তাহ'লে বিয়ে আমার কব্‌কে হছেগা তা-হ'লে?'

কথাটা শুনিবামাত্র পিন্টু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হাড়াম্ মাঝির ঘুম পাইতেছিল, হাসির চোটে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। না বুঝিয়াই সে-ও খানিকটা হাসিল; ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হুঁ, তা বেটে।'

পিন্টুর পাশে বসিয়া লখাই মাদলের উপর তখনও পর্য্যন্ত টিম টিম্ করিয়া চাঁটি মারিতেছিল, হাসি থামিলে পিন্টু তাহাকে এক ঠেলা দিয়া বলিল, 'তা শুনেছিস্, আমাদের পল্‌হানের কপাল্‌টো খুব ভাল।'

মাদলওয়ালা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বলিয়া উঠিল, 'কেনে, কেনে শুনি?'

'জানিস্ না? পল্‌হানের যে বিয়া দিঁয়ে দিছি।'—বলিয়া পিন্‌টু একবার পল্‌হানের মুখের পানে তাকাইল। খুশীতে ও নেশায় সে তখন মুচ্‌কি-মুচ্‌কি হাসিতেছে।

লথাই তাহার সুমুখ হইতে মাদলটা সরাইয়া রাখিয়া বলিল, 'আমারও একটো দে দিঁয়ে। হঁ ত' কি বেটে! লে, তেবে বিয়াই করি।'

কথাটা পিন্‌টু গ্রাহ্য করিল না; আবার সে ঝিমাইতে ঝিমাইতে বলিতে লাগিল, 'বিহা যদি করতে হয় ত' এম্‌নি। যেমন মেইয়া, তেমনি ঘর। জমি আছে, জায়গা আছে, ক্ষেত আছে, খামার আছে। বীর-ভুঁই জিলায় থাকে। একটো বিটি রেখে বাপ্‌ গেইছে মরে'—পল্‌হানের সুখ কত হবেক্। খাবেক্-দাবেক্ ক্ষুর্ত্তি করবেক্। না-হবেক্ খাট্‌তে, না-হবেক্ কিছু!'

পলহানের বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল।

হাড়াম্ মাঝির বয়স হইয়াছে, গায়ের রং ঠিক মাটির মত, কোঁচকানো এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো গায়ের চামড়া—মনে হয় যেন চাষ-দেওয়া ভুঁই। সদ্য ঘুম হইতে জাগিয়া পিন্‌টু মাঝির কথাগুলা সে বেশ মনোযোগ দিয়া শুনিল, ঘাড় নাড়িয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে কহিল,—'হুঁ—। কিন্তুক্ এই আমি বলে রাখ্‌ছি—শুন্!'

এই বলিয়া সে তাহার লম্বা হাতখানি পলহানের কাটা-পায়ের হাঁটুর উপর রাখিয়া বলিল, 'বিয়া ত' না-হয় করবি,—অমন মিয়া যখন পেছিস্—ছাড়্‌বি কেনে? কিন্তুক্ মিয়া যদি ভাল হয়—তবে ত' জান্‌বি—মাগ্‌ লয়, জননী। আ—র যদি দেখিস্ ভাল লয়—খারাপ,—তাহ'লে, এই

আমি বলে' রাখ্ছি তুথে,—মেরে মেরে আধ-মরা করে' দিস্।—ঠ্যাঙ্গার চোটে বাঁদর লাচে। বুঝলি?'

পলহান্ সম্মতি জানাইয়া তাহার ঘাড় নাড়িল।

পলহান যথন ধাওড়ায় ফিরিল, আকাশে তথন জ্যোৎস্না উঠিয়াছে।

আসিবার আগে সে পিনটুকে জিজ্ঞাসা করিতে ভুলে নাই—

'থোঁড়া-ল্যাংড়া বলে' থিস্তা-তামাসা করছিস্ নাই ত' ভাই?'

সিংচাঁদো,* দামুন্দর* আর মারাং-বুরুর* নামে শপথ করিয়া পিনটু বলিয়াছে,—সান্তালী বাপ তাহাকে জন্ম দিয়াছে, সুতরাং মিথ্যার ধার সে ধারে না।

পলহানের আর ভয় নাই।

লোকে যে তাহার এই 'বিহা'র সম্বন্ধটি ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টায় আছে সে-কথাও পিনটুকে সে বলিয়া আসিয়াছে।

পিনটু বলিয়াছে, 'থাতির-জমা।'

ধাওড়ার চালায় পলহানের লাঠির শব্দ হইতেই ঘরের ভিতর হইতে

---

* সূর্য্য দামোদর নদ প্রকাণ্ড পর্ব্বত

ছোট ভাই মতিয়া বলিয়া উঠিল, কেনে গেলি আঁধারে-আঁধারে? ছাগল ত তখন এসেছিল।'

কথাটা যেন সে শুনিতে পায় নাই এমনিভাবে পলহান চুপ করিয়া রহিল।

সেবছর তখন ডাঙ্গায়-ডহরে, ঝোঁপে-ঝাড়ে পলাশের গাছ—যেখানে যত ছিল, পাতা তাহাদের যেন আর দেখাই যায় না,—হাড়ে-গোড়ে ফুল ধরিয়াছে,—রাঙা-রাঙা ডাগর-ডাগর পলাশের ফুল।

পায়ের খাটুনী পল্‌হানের একটু বেশি পড়িল। পিন্‌টুর কাছে দু'বেলা যাওয়া-আসা।

হেলিয়া দুলিয়া ঘাড় নাড়িয়া নানান্ ভঙ্গীতে পল্‌হান পথ চলে, ফাঁকা মাঠে গিয়া এদিক-ওদিক ঘুরিয়া-ফিরিয়া নিজের চলন নিজেই ভাল করিয়া দেখে। দূর হইতে খোঁড়া বলিয়া তাহাকে আর নিশ্চয়ই মনে হয় না!

ঘন-ঘন পিন্‌টুর কাছে যাইতে দেখিয়া মতিয়া বলে, 'অত—ভাল নয় দাদা।'

পল্‌হান বলে, 'শলা আছে, পরামর্শ আছে—বিহা বলে' কথা! বিহা ত' হয় নাই,—অতসব তুঁই জান্‌বি কি করে'?'

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া মতিয়া বলে, 'তুর আর ভাবনা নাই। কি বল্ দাদা!'

পলহান হাসে।

মতিয়া বলে, 'তুর্ ক্ষেতে আমি খাটবগা চল্। গাড়ী আর ঠেল্‌ব নাই ইখানে।'

পল্‌হান ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানায়। বলে, 'বেশত!'

খুশীর চোটে মতিয়া বলিতে থাকে, 'চাষ করব—দেখবি,—চাউলি, আউর—জাও, আউর—গহুম্‌, ঠিসি, জোওরা—সব হবেক তুয়্‌ মাঠে। কিসারি, রাহিড়...'

পল্‌হান খুব জোরের সঙ্গে বলে, 'হয়—আখুনও হয়। শুনিস্‌-কেনে পিনটুর কাছে!—কিন্তুক্‌ বিহার কথাটো আখুন্‌ বলিস্‌ না কাহুকে।'

ভাই কিন্তু থাকিতে পারে না; বলিয়া ফেলে।

বাউরীদের যে-সব মেয়ে আম-বাগানের ভিতর দিয়া গান গাহিতে গাহিতে তাহার সঙ্গে কয়লা-বোঝাই ছোট-ছোট ঠেলা-গাড়ীগুলি খাদের মুখ হইতে 'ডিপো' পর্য্যন্ত ঠেলিয়া লইয়া যায়—তাহাদের কাহারও আর শুনিতে বাকি নাই।

সুন্দরী শোনে নাই, সেও আজ শুনিল।

ইঞ্জিনটা হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেছে,—'হেড-গিয়ার' আর চলে না! শেষ-গাড়ীটা মতিয়াতে-সুন্দরীতে ঠেলিয়া আনিতেছিল। আম-বাগানের মাঝে আসিয়া মতিয়া হঠাৎ হাত ছাড়িয়া দিল।

সুন্দরী বলিল, 'ছাড়লি যে?'

'তা হোক্‌। গাড়ী উঠতে দেরি আছে। চুটি খাই,—বোস্‌।'

গাছের একটা শিকড়ের উপর মতিয়া বসিয়া পড়িল।

মুকুলে-আমে বাগানটা একেবারে ভরিয়া আছে।

সুন্দরী বলিল, 'আমাকে দুটি আম পেড়ে দে দেখি, খাই আমি।'

মতিয়া বলিল, 'উ আম আখুন্ ছুটু।'

'ছুটুই ভাল।'

সুন্দরী আড়চোখে চাহিয়া একবার হাসিয়াই মুখ ফিরাইল।

মতিয়া বলিল, 'বিয়া কর্‌বি আমাকে?

সুন্দরী হাসিতে হাসিতে কহিল, 'তুখে আবার কি-গুণে বিয়া করবরে খাল্‌ভরা?'

'কেনে? কত কানা-খোড়ার বিয়া হছে—।'

হঠাৎ খাদ-মোয়ানে ওঠা-নামার ঘণ্টা বাজিল। ইঞ্জিন চলিয়াছে।

মতিয়ার চুটি খাওয়া হইল না। সুন্দরীর কচি আম খাওয়া বন্ধ রহিল।

গাড়ী ঠেলিতে ঠেলিতে মতিয়া বলিল, 'আমাদের খোড়া-বাইহার* বিহা—।'

'পল্‌হান-খোঁড়ার?'

মতিয়া বলিল, 'হঁ ত, কী মনে করেছিস্?'

সুন্দরী ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল। আড়চোখে হাসিতে গিয়া আর-একটু হইলেই সে পা হিড়কাইয়া লাইনের বাহিরে পড়িয়াছিল আর-কি! বাঁ-হাত দিয়া মতিয়া তাহার কোমরে ধরিয়া টাল সাম্‌লাইয়া লইল।

সেদিন সন্ধ্যারাতে 'বিয়া'।

---

* ভাই

২২

পিনটু নিজে গিয়া সব ঠিক করিয়া আসিয়াছে।

'বীরভূঁই' জেলার 'ডাঙ্গাল-পাড়া'—অনেক দূরের পথ, দুইটা জঙ্গল পার হইতে হয়, আর একটা নদী।

'ঝুঁঝকি' রাত থাকিতে তাহারা বাহির হইল। বরযাত্রী চারজন। মতিয়া ত' আছেই, পিনটু, হাড়াম্ আর গারাং। সঙ্গে গেল একটা মাদল, একটা বাঁশী আর একটা সিঙ্গা; হলুদ-রঙা ধুতি একটি পলহানের আর-একটি লাল রঙের গামছা;—ক'নের জন্য ডোম্-ঘরের লাল চওড়া-পেড়ে একখানি শাড়ী। বাঁশের চোঙায় খানিকটা সর্ষের-তেল মতিয়া তাহার লাঠির ডগায় দড়ি দিয়া বেশ করিয়া বাঁধিয়া ঝুলাইয়া লইয়াছিল। পথশ্রমের ক্লান্তির পর ডাঙ্গাল-পাড়ার কাছাকাছি গিয়া হাতে পায়ে ও মুখে তেলটা বেশ করিয়া মাখিয়া লইলেই চলিবে।

থোঁড়া লোক সঙ্গে আছে বলিয়া গারাং মাঝি একটুখানি জোরে-জোরে পথ চলিতেছিল। অনেকখানি পথ আগাইয়া গিয়া সে একবার ফিরিয়া তাকাইল,—পলহান তখনও অনেক পিছনে পড়িয়া আছে। বলিল, 'আয় থপ করে'—এনেকুটো পথ বেটে।'

পলহান বলিল, 'আ—। ই আর কতটুকুন! মারে দিলম্-বলে'!'

মতিয়া বলিল, 'এঁঃ! দাদার খুব খুশী আজকে।'

জবাব দিতে গিয়া পলহান খক্ খক্ করিয়া কাশিয়া ফেলিল। পান চিবাইতেছিল,—অনভ্যাসের দরুণ বোধকরি পানের ছিবড়ে তাহার গলায় লাগিয়া গেছে। কানে একটা মস্তবড় শালপাতার চুটি গোঁজা। লাঠি দুইটা এইবার খুব ঘন-ঘন মাটিতে পড়িতে লাগিল।

লাল-রঙের গামছাটা পলহানের মাথার উপর পাগড়ীর মত করিয়া

বাঁধা ছিল। তাড়াতাড়ি হাঁটিতে গিয়াই বোধকরি হঠাৎ সেটা খসিয়া পড়িল। পিন্টুকে বলিল, 'দে ত' বেশ আঁট্ করে' বেঁধে!'

বাঁধিয়া দিবার জন্য পিনটুকে দাঁড়াইতে হইল।

অজয়-নদী পার হইয়া অবধি তাহারা 'বীরভূঁই'-এর মাটির উপর দিয়া পথ চলিতেছিল।

দূরে কয়েকটা তালগাছের সারির ফাঁকে দিনান্তের সূর্য্য তখন রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিমের আকাশ তখন লালে লাল।

গরুর গলার ঘণ্টা বাজিতেছে। রাঙা-মাটির পথের উপর অপর্য্যাপ্ত ধূলা উড়াইয়া কয়েকটা গরুর গাড়ী দূরের শহর হইতে বোধকরি গ্রামে ফিরিতেছিল।

সে-পথ ছাড়িয়া বরযাত্রীর দল ডানদিকে রাস্তা ভাঙ্গিল। সবুজ কচি ঘাসে-ভরা ডাঙ্গার পথ,—দু'ধারে সিঁয়াকুলের ঝোপ। সুমুখে মাঠের ওপারে প্রকাণ্ড একটা শালের জঙ্গল সুরু হইয়াছে,—কোথায় গিয়া তাহার শেষ, কে জানে!

আর সেই জঙ্গলের পাশে দূরের দুইটা পাহাড়ের উঁচু মাথা দেখা যাইতেছে।

পিন্টু বলিল, 'উ-ই মারাং-বুরু*—!'

বলিবামাত্র তাহারা পাঁচজনে সেই উন্মুক্ত প্রান্তরের উপর দাঁড়াইয়া

* প্রকাণ্ড পর্ব্বত

পড়িল। লাল আকাশের গায়ে ফিকে-সবুজে আঁকা দূরের সেই দুইটি পর্ব্বত-শৃঙ্গের উদ্দেশে যুক্তকরে প্রণাম করিয়া আবার তাহারা পথ চলিতে লাগিল।

বনের সবুজ ক্রমশ আরও চিকন্—আরও ঘন হইয়া আসিল।

গাছের ঝরাপাতা ঝাঁট দিয়া জড় করিয়া রাখা হইয়াছে। অদূরে সারিবন্দি কয়েকটি গাছের তলায় খড়ের চাল-দেওয়া ছোট-ছোট মাটির ঘর। ঘর-পঁচিশেক সাঁওতালের বস্তি। কয়েকটা কুকুর ও মুর্গী জঙ্গলের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

পিন্টু আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া দিল, 'ওই ডাঙ্গাল-পাড়া!'

দিনান্তের সূর্য্যরশ্মি গাছের পাতার ফাঁক দিয়া মুখে আসিয়া পড়িতেছিল, বাঁ-হাতটা চোখের উপর আড়াল করিয়া পল্‌হান্ একবার ডাঙ্গাল-পাড়াটা দেখিয়া লইল।

তাহাদের গাছের তলায় বসিতে বলিয়া হাড়াম্ মাঝির হাত হইতে শিঙ্গাটা লইয়া পিন্টু তাহাতে ফুঁ দিল। সে কি প্রচণ্ড শব্দ! নিস্তব্ধ বনানীপ্রান্ত যেন কাঁপিয়া উঠিল!

শব্দ শুনিয়া কতকগুলা ছেলে-মেয়ে ঘর হইতে বাহির হইয়া জাঁওয়াই দেখিবার জন্য ছুটিতে ছুটিতে তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দূরে দাঁড়াইয়া কয়েকটা কুকুর চীৎকার করিতে লাগিল।

এদিকে কন্যাপক্ষের লোকেরাও তখন ঠিক হইয়া ছিল। মাদল ও বাঁশী বাজাইয়া গান গাহিতে গাহিতে বরযাত্রীদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য তাহারা বাহির হইয়া আসিল।

'দে পেড়া দেলা পেড়াদে দুড়ুপ পে

গাণ্ডো মাচি পেড়া মেনাঃ তা লেয়া

তাং আপেয়ালে পেড়া ঝাড়ি লোটাতে

ওঁয়ান্ পে পেড়া বেয়াড়্ কাণ্ডা দাঃ!'

—অর্থাৎ হে কুটুম্ব! তোমরা এসে বসো। আমাদের পিঁড়ি আছে, মাচিয়া আছে। হে কুটুম্ব! আমরা তোমাদের লোটায় জল দেবো। এই ঠাণ্ডা কলসীর জল খাও!

বরযাত্রীর দলও চুপ করিয়া বসিয়া রহিল না। শিঙ্গা ফেলিয়া পিনটু তাহার গলায় মাদল তুলিয়া লইল। পলহান হলুদ-রঙা কাপড় পড়িয়া মাথায় গামছা বাঁধিয়া গাছের তলায় বসিয়া রহিল মাত্র, আর-সকলে নাচিয়া নাচিয়া গাহিতে লাগিল।

'সাঙ্গিং দিসম্ পচা, সঙ্গে বরিয়াৎ

বহড়্দারে রেখো—ডেরা ফেতলে

দাকা হুতুদ্ তিমিন্ রেচাং

হুকা তামাকুর এমা লেপে।'

—অর্থাৎ আমরা দূরদেশের বরযাত্রী। শুকনো গাছের তলায় বাসা-বাড়ী দিলে। খাবার পরিবেশন করতে দেরি হতে পারে, এখন আমাদের হুঁকো দাও, কল্‌কে দাও!

এমনি করিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া উভয়পক্ষের গান চলিতে লাগিল। বরযাত্রীর দল এতখানি পথ হাঁটিয়া আসিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। গান গাহিতে গাহিতে তাহারা ক'নের বাড়ীর দিকে রওনা হইল।

বিবাহের আয়োজন মন্দ হয় নাই। বড় বড় দুইটা খাসী ছাগল কাটা হইয়াছিল, হাঁড়িয়া ত' ছিলই! গ্রামের মধ্যে গোটা-পঞ্চাশেক্ সাঁওতালের বাস, তাও আবার মহুয়া গাছের ওপারে যাহারা থাকে, তাহারা কেহই আসে নাই। কেন আসিল না কে জানে।

ঘরের উঠানে কচি তালপাতার মণ্ডপ তৈরী হইয়াছিল। বিবাহের যাহা-কিছু করিল, গাঁয়ের মোড়ল বুড়া রাম্‌হাই সোরেন্। তা' ছাড়া আর কেই বা করিবে? মেয়ের ভাই-বোন নাই, মা ত' অনেককাল আগেই মরিয়াছে, বাপও এই সেদিন মারা গেল। মেয়ে এখন একা। তবে অবস্থা সবার চেয়ে ভাল। বিঘে-দশেক জমি, গাই, গরু, মুরগী, ছাগল;—দু-তিন জনের বসিয়া খাওয়া চলে।

খোঁড়া পলহানের কপাল ভাল।

মেয়ে দেখিয়া পল্‌হান্ বলিল, 'শাড়ীটো হয়ত' খাটো হবেক পিনটু।'

তা খাটো হওয়া আশ্চর্য্যের কিছু নয়। মেয়ে বেশ ডাগর-ডোগর, বয়স প্রায় কুড়ি-বাইশের কাছাকাছি,—জোয়ান মেয়ে।

আহারাদি শেষ হইয়া গেলে কন্যাসম্প্রদানের 'বিন্তি'* সুরু হইল।

টগরীকে মানাইয়াছিল ভারি চমৎকার! মাথায় একমাথা কালো-চুলের খোঁপা, তার উপর শিরিশের ফুল গোঁজা, পরণে লাল চওড়া-পাড়

* মন্ত্র

হলুদ-রঙা শাড়ী। রামহাই সোরেন তাহার হাত ধরিয়া ধীরে-ধীরে মণ্ডপে আনিয়া হাজির করিল।

তালপাতার চাটাইয়ের উপর পল্‌হান্‌ তাহার কাটা-পায়ের হাঁটু-অবধি ঢাকা দিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

টগরীকে আসিতে দেখিয়া সে তাহার লাঠি দুইটা হাত দিয়া ঠেলিয়া একটুখানি দূরে সরাইয়া দিল।

পিনটু মাঝি হাত বাড়াইয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। রামহাই সোরেন বলিল 'নি বাবা, হড়ইং সম্প্রতাপে কানা।'—অর্থাৎ নাও বাবা, বধূকে তোমাদের হাতে তুলিয়া দিতেছি।

টগরীর হাত ধরিয়া তাহাকে পিঁড়ির উপর বসাইয়া দিয়া পিনটু বলিল, 'হেঁ বাবা, আঁম কেদালে।'—অর্থাৎ হাঁ বাবা, আমরা পাইলাম।

রামহাই সোরেন টগরীর পাশে উবু হইয়া বসিল, খুক্‌ করিয়া কাশিয়া গলাটা তাহার একবার ঝাড়িয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, 'আদ কুটিয়ে কান্‌, ভেংড়ে কান্‌, কাঁড়াক্‌ কান্‌, লেঢাক্‌ কান্‌, গাড়হাক্‌ সতক্‌ কান্‌, আলেয়াঃ এলেকা দ বান্থঃ আনা।'

—এখন কুঁড়ে হোক, দুষ্ট হোক, কানা হোক, খোঁড়া হোক, খারাপ হোক, আমাদের আর এলেকা নাই।

বরপক্ষের সকলেই একবার করিয়া ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

রামহাই সোরেন একটুখানি থামিয়া আবার বলিতে সুরু করিল, 'রাঙ্গক্‌ কান্‌, ক' কান্‌, দেড়ি কান, ছিনেরক কান, রানক্‌ কান, নঞ্জমক্‌

কান্, ওড়াক' গুনেক্ হড়কো বেনাওক্ আ– গোড়া গুনেক্ গেই কো বেনাওক্ আ।'

রাং হোক, তামা হোক, দুষ্টা হোক, ভ্রষ্টা হোক, অবাধ্য হোক,—ঘর-গুণে মানুষ হয়, গোয়াল-গুণে গাই হয়।

সকলেই ঘাড় নাড়িল।

রামহাই আবার বলিল, 'জাং হঁ, জাং তরই হঁ, তরই লে এক্রিং আকাদা, বহঃ মায়াম্ লতুর মায়াম্ ইনে দ বালে এক্রিং আকাদা।'

—হাড় হোক, ছাই হোক, আমরা বিক্রি করিয়াছি, কিন্তু মাথার রক্ত কানের রক্ত বিক্রি করি নাই। অর্থাৎ ইহাকে তোমরা খুন-জখম্ করিতে পারিবে না।

'ওনাদলে পাঞ্জায়ে গিয়া, তবে মিং-দিন তারা-দিন দাকা-রঙ্গক্, উতু-রঙ্গক সয়াওকে লাহাওকেয়া পে। শিখেউ শিখেউতে পাঢ়হাওতে বাং গানাক খান, ইনরে মিট্টে-হড়বড়ে কোল আলেপে চেপেদাবন।'

—খুন-জখম্ করিলে আমরা তাহার প্রতিশোধ লইব। তবে একদিন আধদিন ভাত-পোড়া তরকারি-পোড়া সহ্য করাইও। শিখাইয়া পড়াইয়া ভাল না হয়, আমাদের কাছে একজন লোক পাঠাইয়া দিও, আমরা সে সম্বন্ধে যুক্তি-পরামর্শ করিব।

রামহাই-এর বয়স হইয়াছিল। বুড়া আর রাত জাগিতে পারিবে না বলিয়া 'বিন্তি-কথা' শেষ হইবামাত্র সে তাহার লাঠিটি হাতে লইয়া ধীরে-ধীরে উঠিয়া গেল।

টগরী তখনও সেইখানেই মুখ নীচু করিয়া বসিয়াছিল। মোড়ল

উঠিয়া গেলে টগরীর সমবয়সী কয়েকটা মেয়ে আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া হৈ-চৈ সুরু করিয়া দিল। একজন তাহার হাতে ধরিয়া পিঁড়ি হইতে টানিয়া তুলিয়া দিয়া বলিল, 'উঠ!'

আর-একজন তাহার গলা জড়াইয়া কানে-কানে কি একটা কথা বলিতেই টগরী মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

তাহার পর সকলে মিলিয়া হাসিয়া হাসিয়া সুর করিয়া গান ধরিল,

'ধোড়্ ধোড়্ মে তাড়াম্ তাড়াম্ মোড়ল ঘাটরে বাবু
চৌডাল ডাঙ্গে
মলম্ মলম্ তেকো সিন্দুর কাটি,
মেলোকান্দ বাবু বোঙা লেকা—।'

—দোড়্, দোড়্, দৌড়ে যা, চৌদোল আম্লকির ডালে আট্কে গেছে। কপালে সিন্দুর দেওয়াতে যেন দেবতার মত দেখাচ্ছে!

অনেকক্ষণ হইতেই পিনটুকে কি-একটা কথা বলিবার জন্য পলহান উস্-খুস্ করিতেছিল। এইবার চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, 'তুর সঙ্গে ইয়াদের তবে কি কথা হঁয়েছিল—কি তবে?'

পিনটু বলিল, 'কেনে?'

পলহান বলিল, 'ওই-যে তবে বুঢ়া বললেক, মেয়েটো যদি দুষ্টু হয়, আমাদের কাছকে লোক পাঠাঁই দিস্। লোক আবার পাঠাব কোথাকে? আমি ত' এইখানেই রইব।'

পিনটু বলিল, 'কনু ভাবনা নাই তুয়। কাল থেকে তুঁই এইখানেই থাক্‌বি।'

বিস্তি-কথায় বলিতে হয়, বুড়া রামহাই সোরেন তাই ও-সব কথা বলিয়া গিয়াছে।

ঘাড় নাড়িয়া পলহান বলিল, 'বেশ।'

পরদিন বিদায়ের পালা।

সকাল হইতে মদের ছড়াছড়ি। নাচ-গান আর শেষই হয় না!

টগরীকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার সখীর দল নাচিতে নাচিতে গান গাহিতে লাগিল।

'গাতে গাতে লাং তাহে কানা
অডি গাতে লাং তাহে কানা
মেৎ এঁপেল্ হ আরসি মেনাঃ
আলাং এঁপেল হ বাম্ব আ।'

—আমরা অনেক কাল এক জায়গায় ছিলাম,—তোমাকে ঠিক নিজের প্রাণের মত ভালবাসি। আমাদের নিজের মুখগুলো দেখবার জন্যে না-হয় আরসি আছে, কিন্তু হায়! তোমাকে দেখবার আর আশা নেই।

...গান কিন্তু তাহারা মিছাই গাহিল। টগরীও গেল না, জাঁওয়াইও গেল না। বিদায় হইল শুধু বরযাত্রী চারজন।

যাবার সময় পিনটু বলিল, 'হ'লো ত' ইবারে? জিউটো বাঁচলো ত?'

পলহান মুখে কোনও কথা বলিতে পারিল না, মাত্র ঈষৎ হাসিয়া তাহার কৃতজ্ঞতা জানাইল।

মতিয়া অনেকক্ষণ হইতে বলি-বলি করিয়া এইবার একটা ঢোঁক গিলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি আবার কখন আসব বাগ্নহা?'

বলিতে বলিতে ডাগর-ডাগর চোখ দুইটা তাহার ছল ছল করিয়া আসিল।

পলহান বলিল, 'হঁ আসবি,—এই আমি…এই…বলে' পাঠাব।'

মতিয়া নীরবে শুধু ঘাড় নাড়িল।

চলিতে চলিতে মতিয়া দু' তিনবার ফিরিয়া তাকাইল।

'আসি তাহ'লে বাইহা?'

পলহানের কাছ হইতে কোনও জবাব পাওয়া গেল না।

পলহানের দিন বেশ কাটে।

চমৎকার জায়গা!

চোখে-চোখে দেখা হইলেই টগরী একবার ফিক্ করিয়া হাসে……

বয়স হইলে কি হয়,—মেয়েটা ভারি লাজুক।

পলহান বলে, 'অত লাজ ভাল লয়।'

হাসিতে হাসিতে টগরী সেখান হইতে ছুটিয়া পালায়। খোঁড়া আর নাগাল পায় না।

দিন-মজুর

পলহানের এখন আর দুই বগলে দুইটা লাঠির প্রয়োজন হয় না। একটা লাঠিতেই কাজ চলে।

সকালে সেদিন টগরী বলিল, 'গাই দুইতে পারিস্ ?'

'কেনে লারব ? খুব পারি।'

বড় একটা কাঁশার জাম-বাটি লইয়া পলহান গাই দুহিতে গেল। ঢেঁকৃশালের পাশেই গাই বাঁধিবার চালা।

অনেক কষ্টে বাছুর বাঁধিয়া, ফেলাইয়া-ছড়াইয়া এক বাটির জায়গায় আধ-বাটি দুধ লইয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পলহান টগরীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিনয়বাবু কতক্ষণ আসিয়াছে কে জানে !

কয়েকদিন হইতে এই বাঙ্গালী-বাবুটি রোজ ঠিক এমনি সময়ে দুধ লইতে আসে। জঙ্গলের ও-পারে কি-একটা গাঁয়ে তাহার ঘর।

টগরী বলে, 'ক'মাস আসে নাই, বাবুর জ্বর হঁইছিল।'

'তা হোক্।'

সে-কথা পলহান মনে-মনেই বলে।

দুধের বাটি লইয়া বিনয়বাবু চলিয়া গেলে টগরী জিজ্ঞাসা করিল,—

'কুন্ গাইটো দুইলি ?'

পলহান বলিল, 'ধলাটো।'

টগরী বলিল, 'কুঁইলেটো আমি দুইব। ছুট্‌কি আসবেক আখুনি দুধ লিতে।'

ছুটকি বলিয়া একটা সাঁওতালের মেয়ে আর-একটা গাই-এর দুধ লইয়া যায়।

পলহান জিজ্ঞাসা করিল, 'দুধের দাম কত ইখানে ?'

টগরী বলিল, 'কে জানে ! অতসব জানি না।'

'বা—! বিনয়বাবু কত দেয় মাস-কাবার ?'

'কিছু দেয় না,—উ অম্‌নি।'

তাচ্ছিল্যভরে কথাটার উত্তর দিয়া টগরী সেখান হইতে উঠিয়া যাইতেছিল, বলিল, 'আর ইয়ে ?—তুর ওই ছুটকি ?'

'উ-ও অম্‌নি।'

অবাক হইয়া পলহান তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। বলিল, —'বা-রে !'

টগরী বলিল, 'দুধ'কে খায় কে ? আমি খাই না '

'আমি ত' খাই !'

'টুক্‌ছেন্‌-করে' রাখিস্‌ তবে কাল থেকে।'

টগরী চলিয়া গেল। পলহানের আর-কিছু জিজ্ঞাসা করা হইল না।

কাজের মধ্যে দুই—খাই আর শুই !

গরু-চরানো, গাই-বাছুরকে খাইতে দেওয়া—এগুলা আবার কাজ !

টগরীর হাতের রান্না পলহানের ভারি ভাল লাগে। বলে, 'মিয়াঁ-মানুষের হাতের রান্না খেয়েছি সেই কবে—ছুটু-বেলায় ; ভুলে গেইছি।'

খুব বেশি ভাত-তরকারি পলহানের পাতের উপর ঢালিয়া দিয়া টগরী বলে, 'খা তবে, আবার মনে পড়তে চায়।'

'তাই-বলে' এত-গলা নাকি?'

টগরী হাসিতে হাসিতে বলে, 'তা বললে শুনব কেনে? খেতে হবেক্।'

পলহান প্রাণপণে সব খাইয়া ফেলে।

বলে, 'এম্‌নি করে' খেলে দুদিনেই ফুলে' ঢাক্ হ'য়ে যাব দেখবি।'

হইলও তাই।

মাস-দুইএর মধ্যেই দেখা গেল, পলহান বেশ মোটা-সোটা হইয়া উঠিয়াছে।

বৈশাখ মাস। রোজ বৈকালে আকাশটা অন্ধকার করিয়া আসে, ঝড় ওঠে, কোনো-কোনোদিন বৃষ্টিও হয়। দূরের রাস্তা হইতে রাঙা ধূলা উড়াইয়া ঘূর্ণী-বাতাস বোঁ-বোঁ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে তাহাদের ডাঙ্গাল-পাড়ায় আসিয়া থামে, কখনও-বা লাট্টুর মত পাক খাইতে খাইতে ফাঁকা মাঠের উপর দিয়া কোথায় চলিয়া যায় কে জানে!

এম্‌নি দিনে সাঁওতালদের মেয়েরা দল বাঁধিয়া বনের ভিতর ঝরা-পাতা কুড়াইতে যায়। শুক্‌নো পাতা বোঝা বাঁধিয়া ঘরে লইয়া আসে। বর্ষার দিনে জ্বালানি কাঠের কাজ চলে।

পলহান বলে, 'একা-একা তুঁই কি-ক'ত্তে যাস্ টগরী? কই—উয়াদের সঙ্গেও ত' যাস না?'

মুখ ভারি করিয়া টগরী বলে, 'যাই,—বেশ করি।'

পলহান বলে, 'কই, পাতা ত' একদিনও আনতে দেখলম্ নাই তুখে?'

টগরী বলে, 'তুঁই কি-ক'ত্তে রইছিস? কাঠ কেটে' দিবি।'

পলহান বলে, 'না—তুঁই যেতে পাবি নাই।'

টগরী বলে, 'আমি যাব। তুর্ কি?'

টগরী আবার যায়।

ঝড়-জলের সঙ্গে হঠাৎ সেদিন বড় বড় পাথর পড়িতে সুরু হইল।

'ঢেঁক-শালে'র চালায় বসিয়া পলহান জঙ্গলের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিল। টগরী পাতা কুড়াইতে গিয়াছে।

কচি শালের গাছগুলা ঝড়ের ঝাপটে যেন একেবারে নুইয়া পড়িতেছে।

সুমুখে একটা পুকুর। জল যেন ঠিক কাঁচের মত!

ঘন ঘন বৃষ্টির ঝাপটা লাগিয়া জলের উপর কুয়াশার মত ফিনকি উড়িতেছে। জমি সেয়াতের জন্য পাড়ে একটা 'টেঁড়া' বসানো হইয়াছে, সেটা বুঝি আজ আর থাকে না।

বাঁশের ঝাড়ে বাতাস লাগিয়া কোথায় যেন বাঁশী বাজিতেছে।

এমন সময় পলহানের চোখের সুমুখে বৃষ্টির ঘন আবরণ ভেদ করিয়া জঙ্গলের ভিতর হইতে মনে হইল কে যেন ছুটিতে ছুটিতে সেইদিকেই আগাইয়া আসিতেছে।—বোধ হয় টগর।

হাঁ টগরীই বটে!

ভিজা কাপড় ঝটুপট্ করিতে করিতে সে তাহারই কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আপাদ-মস্তক ভিজা,—মাথার চুলগুলা খুলিয়া গেছে! টগরী হাঁপাইতেছিল।

পলহান কি-যেন বলিতে গেল, কিন্তু কথাটা হঠাৎ তাহার মুখেই আটকাইয়া রহিল।

তেমনি আগাগোড়া ভিজিয়া তাহার পিছনে ছুটিতে ছুটিতে বিনয়বাবু আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'ভিজে গেলম টগরী।'

পলহান একবার তাহার মুখের দিকে তাকাইল।

কিন্তু বিনয়বাবু এ-সময় কেন? এখন ত' দুধ লইবার সময় নয়…

*

সেদিন রাত্রে টগরীর সঙ্গে পলহানের ভীষণ ঝগড়া।

এমন প্রায় প্রতি-রাত্রেই হয়, কিন্তু সেদিন যেন একটুখানি বাড়াবাড়ি হইয়া গেল।

টগরীর গায়ের জোর পলহানের চেয়ে ঢের বেশি। খোঁড়া মানুষ, —কোনো রকমেই না পারিয়া শেষে সে টগরীর হাতের উপর অন্ধকারেই এক কামড় বসাইয়া দিল।

'দে ভাত দে!'

টগরী একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—

'দিছি,—বোস্।'

...দিনকতক পরে ছুট্‌কি যে ছেলেটাকে রোজ কোলে করিয়া লইয়া আসিত, টগরী তাহাকে আর ছাড়িল না, বলিল,—

'ছেলেটা থাক্ আমার কাছে।'

ছুট্‌কিকে এতটুকু আপত্তি করিতে দেখা গেল না, হাসিতে হাসিতে বলিল, 'থাক্।'

সেইদিন হইতে ছেলেটাকে লইয়া টগরী যেন একেবারে মাতিয়া উঠিল। কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে জবাব দিতে যেন আর তাহার অবসরই থাকে না।

পলহান বলে, 'বাবাঃ! পরের ছেলে—এত কেনে?'

হাসিতে হাসিতে টগরী বলে, 'পরের ছেলে কেনে হবেক্? আমার ছেলে।'

পলহান ঈষৎ হাসিয়া বলে, 'ধেৎ!'

টগরী আবার হাসে, বলে, 'মন্‌কে লিছে নাই, লয়? কিন্তুক্ সত্যি বলছি আমি। ই ছেলে আমার।'

'যাঃ—।'

বলিয়া পলহান কাজে চলিয়া যায়।

কিন্তু তাহার ভাল লাগে না।

মাঝে-মাঝে ছেলেটার মুখের পানে সে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া তাকায়,—আর তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন রী-রী করিয়া ওঠে...

সেদিন এই ছেলেটাকে লইয়া আবার এক-পশলা ঝগড়া হইয়া গেল।

দুধ লইতে আসিয়া বিনয়বাবু সেদিন এই ছেলেটাকে কোলে লইয়া আদর করিতেছিল।...বাঙ্গালী বাবু—সাঁওতালের ছেলেকে কোলে লইয়া আবার আদর করিয়াছে কবে? আদর করুক্ কিন্তু মুখে-মুখে 'চুম্' খায় কেন?—আর সে কি একবার?...গোয়ালের কাছে টগরী স্বচক্ষে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, হাসিল,—অথচ মুখে কিছু বলিল না।

—এই লইয়া ঝগড়া!

অনেকক্ষণ হইতেই কথা কাটা-কাটি চলিতেছিল।

পল্হান্ বলিল, 'ইদিকে ত' লাজের নাই সীমে,—আর ইদিকে খুব!'

জবাব না দিয়া টগরী অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

পল্হান্ আবার বলিল, 'কেনে চুম্ খাবেক্? চুম্ কি খেলেই হ'লো!'

টগরী বলিল, 'খাবেক্, বেশ করবেক্।'

'কেনে,—উ তুয়্ কে বেটে কে?'

মুখ ফিরাইয়া টগরীও পাল্টা গাহিল, 'কেনে তুঁই আমার কে বেটিস্ কে?'

স্ত্রীর মুখে এত বড় কথা পলহানের সহ্য হইল না।

হাতের লাঠিটা তুলিয়া বলিল, 'দেখেছিস ঠেঙ্গা? কে বেটি আখুনি বুজোঁই দিব।'

টগরী বলিল, 'ও মা আমার কে রে! এত আমাকে ভালবাসে!'

লাঠিটা ধীরে-ধীরে হাত হইতে নামাইয়া পলহান বলিল, 'না—বাসি না?'

'হঁ—বাসিস্!'

'দেখবি?'

'দেখেছি।'

ঢেঁক্‌শালে বসিয়া কথা হইতেছিল।

'দেখবি তবে?'

বলিয়া সুমুখের ঢেঁকির উপর পলহান তাহার মাথাটা ঠাই ঠাই করিয়া ঠুকিতে লাগিল।

'ও মা গ,—ই কি জ্বালা গ, ই কি ফেসাদ্ গ!'

টগরী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল।

পলহানের ঝাঁক্‌ড়া ঝাঁক্‌ড়া চুলগুলা তখন মুখের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে! কপালের খানিকটা জায়গা ফুলিয়া দর্ দর্ করিয়া রক্ত ঝরিতেছিল!

টগরী ধীরে-ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

'মর্ যা-খুশী তাই কর্। আমার চোখের-ছামুতে কেনে?'

পলহানও উঠিল। বগলে লাঠি লইয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চালা হইতে নামিয়া আসিয়া বলিল, 'রইব নাই ইথানে আর! চল্‌লাম। ভিক্ মেগে খাব—সেও ভাল।'

পলহান খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে মহুয়া গাছের তলা দিয়া সুমুখে ডাঙ্গার রাস্তা ধরিল।

'মর্‌গা যা!'—বলিয়া টগরী একবার তাকাইয়া দেখিল মাত্র।
মধ্যাহ্নের সূর্য্য তখন মাথার উপর প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু বেলা গড়াইতে না গড়াইতে দেখা গেল, দূরের পাল হইতে গাই-বাছুরগুলাকে ডাকাইয়া তাহাদের পিছু-পিছু ঠুক্ ঠুক করিতে করিতে পলহান আবার ডাঙ্গাল-পাড়ার দিকেই ফিরিয়া আসিতেছে।

গরুগুলা বাঁধিয়া পল্‌হান দরজায় আসিয়া দাঁড়াইতেই টগরী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'ফিরে এলি যে?'

কোনও কথা না বলিয়া পলহান ধীরে ধীরে চালার উপর উঠিয়া বসিল। মুখখানা শুকনো, পায়ে একহাঁটু ধূলা উঠিয়াছে, রক্তের দাগটা শুকাইয়া গেছে, কিন্তু কপালের ফুলাটা তখনও কমে নাই।

টগরী বলিল, 'ভাত খা, ভাত রইছে কখন্ থেকে তার ঠিক নাই।'

পলহান এবারেও চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে ভাতের থালাটা তাহার সুমুখে নামাইয়া দিবামাত্র ক্ষুধার্ত্ত কুকুর যেমন করিয়া খায়, পলহানও ঠিক তেমনি করিয়াই নিমেষের মধ্যেই থালাটা শেষ করিয়া ফেলিল।

তাহার পর হামেসাই এমনি হইতে থাকে।

একদিন যায়—দুদিন যায়, আবার কোনও ছুতা পাইলেই পলহান ঝগড়া করে, রাগ করিয়া চলিয়া যায়। বলে, 'আর আস্‌ছি নাই বাবা!'

কিন্তু খাবার সময় হইলেই আবার ফিরিয়া আসে। কোনোদিন এক-বেলা খায় না,—কোনোদিন-বা দুই বেলাই খায়।

টগরী বলে, 'যাবি কুথা?'

পলহান বলে, 'ঠিক যাব—তুঁই দেখে লিস্।'

কিন্তু যায় না। যেমন দিনকতক ফুলিয়া উঠিয়াছিল, দেখিতে দেখিতে আবার তেমনি শুকাইয়া সরু হইয়া যাইতে লাগিল।

রাগ করিয়া ফিরিবার পথে বনের পাশে হঠাৎ সেদিন তাহার বিনয়-বাবুর সঙ্গে দেখা।

পলহান ডাকিল, 'এই বাবু, শুন্!'

বিনয়বাবু থমকিয়া দাঁড়াইল।

সন্ধ্যা তখন ঘনাইয়া আসিয়াছে।

পলহান বলিল, 'কুথা যেছিস্ কুথা?'

ডাঙ্গাল-পাড়ার পথেই সে চলিতেছিল। আঙুল বাড়াইয়া দূরের একটা গাঁ দেখাইয়া দিয়া বলিল, 'হোই—ওই গাঁটোতে যেছি। কেনে?'

পলহান্ বলিল, 'দুধ লিতে আর যাস না তুঁই, দুধ আর দেয়া হবেক নাই তুখে।'

'বেশ।'

আর-কিছুই সে বলিতে পারিল না। ডাঙ্গাল-পাড়ার পথ ছাড়িয়া মাঠের দিকে পথ ভাঙ্গিয়া বিনয়বাবু সেই দূরের গ্রামটার দিকেই চলিতে লাগিল।

'আর, হা—শুন্! ভাল্!'

বিনয়বাবু আবার ফিরিয়া তাকাইল।

'থারাপি হঁয়ে যাবেক কুন্‌দিন তাহ'লে। শুন্‌লি?'

কথাটা শুনিয়া বিনয়বাবু একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে বিনয়বাবুকে আর দুধ লইতে আসিতে দেখা গেল না।

পলহান আর সেদিন রাগ করিয়া কোথাও যায় নাই। মাঠের ধারে বসিয়া গাই-বাছুরের জন্য সমস্তদিন ঘাস চাঁচিয়াছে।

সন্ধ্যায় ঘাসের বোঝা লইয়া সে ঘরে ফিরিতেছিল, টগরী বলিল, 'কি বলেছিস্ বিনয়বাবুকে?'

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পলহান বলিল, 'বেশ করেছি—বলেছি।'

'বেশ করবি কি-রকম?'

ঘরের দিকে চলিতে চলিতে পলহান বলিল, 'দিব শালার কুন্‌দিন মাথাটো ফুটোঁই। দেখে-লিস্ তুঁই!'

'দিলেই হ'ল কি-না! উ তুর্ কি কল্লেক?'